অধ্যায় ৯

মানব জীবনের ধারাবাহিকতা
Continuation of Human Life

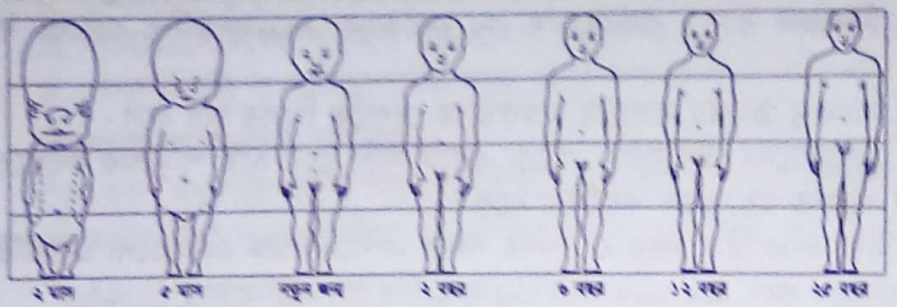

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- বয়ঃসন্ধিকাল
- নিষেক
- গ্যাস্ট্রুলেশন
- গর্ভ নিরোধক
- রজঃচক্র
- ইমপ্ল্যান্টেশন
- ভ্রূণীয় স্তর
- IVF
- সিফিলিস
- গনোরিয়া

প্রজনন প্রক্রিয়ায় জীব নিজ সত্তাবিশিষ্ট অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে নিজ প্রজাতির স্থায়িত্ব বজায় রাখে। মানুষের বংশবৃদ্ধি **যৌন জনন** প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। এদের পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থান করে। এ অধ্যায়ে মানুষের পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র, যৌনবাহিত রোগ এবং প্রজননজনিত সমস্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

পিরিয়ড সংখ্যা-১১ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. গর্ভাবস্থায় করণীয় দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৫. আইভিএফ পদ্ধতির উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. প্রজনন জনিত সমস্যাসমূহের প্রতিকার বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. যৌনবাহিত রোগসমূহের লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পাবে। ৮. প্রজনন জনিত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং এর সুস্থতা রক্ষায় সচেষ্ট হবে।	● পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া ● স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া ● প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা ○ রজঃচক্র ও বয়সন্ধিকাল ও এ সময়ের পরিবর্তনসমূহ ○ গ্যামেট সৃষ্টি, নিষেক, ইমপ্ল্যান্টেশন ○ ভ্রূণ গঠন ও তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি ● গর্ভাবস্থা ও পরিচর্যা ● গর্ভনিরোধ পদ্ধতি; কৃত্রিম গর্ভধারণ ● প্রজনন তন্ত্রের সমস্যা ○ পুরুষ ও নারীর প্রজনন অক্ষমতা ○ পুরুষ ও নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা ○ ভ্রূণের বৃদ্ধির সমস্যা ● যৌনবাহিত রোগ (সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস) লক্ষণ ও প্রতিকার

ক. পুরুষ প্রজননতন্ত্র (Male Reproductive System)

মানুষের শুক্রাণু উৎপাদন, সঞ্চয় ও পরিবহন কাজের ভিত্তিতে পুরুষ জননতন্ত্রকে দুভাগে ভাগ করা যায়। **মুখ্য** (primary) ও **আনুষঙ্গিক** (accessory)। যে অঙ্গ শুক্রাণু উৎপন্ন করে, তাকে **মুখ্য জনন অঙ্গ**; এবং যে সব অঙ্গ শুক্রাণু সঞ্চয় ও পরিবহনের কাজে নিয়োজিত সেগুলোকে **আনুষঙ্গিক জনন অঙ্গ** বলে।

শুক্রাশয় হচ্ছে মুখ্য জননাঙ্গ, বাকি অঙ্গগুলো আনুষঙ্গিক। পুংজননতন্ত্র নিম্নোক্ত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. শুক্রাশয় (Testes) : প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা একজোড়া ডিম্বাকার শুক্রাশয় **স্ক্রোটাম** (scrotum) নামক একটি থলির ভিতর আবদ্ধ এবং শুক্ররজ্জু দিয়ে লাগানো অবস্থায় দু'পায়ের উরুসন্ধিতে উপাঙ্গের মতো ঝুলে থাকে। স্ক্রোটামের ভিতর শুক্রাশয়দুটি পাশাপাশি অবস্থান করে। বাম দিকের স্ক্রোটাম বড় এবং কিছুটা ঝোলা। প্রতিটি শুক্রাশয় লম্বায় প্রায় ৪ সে.মি. এবং ওজনে ১০-১২ গ্রাম। শুক্রাশয় এ টি আবরণ থাকে।

প্রত্যেক শুক্রাশয়ের ভিতরে প্রায় ১০০০টি সূক্ষ্ম ও প্যাঁচানো **সেমিনিফেরাস নালিকা** (seminiferous tubules) থাকে। সেমিনিফেরাস নালিকা কতকগুলো সংগ্রাহক নালিকায় উন্মুক্ত হয়ে যে জালিকার গঠন সৃষ্টি করে তাকে **রেটি টেসটিস** (rete testis) বলে। রেটি টেসটিস থেকে প্রায় বিশটি ৪-৬ মিলিমিটার লম্বা সংগ্রাহক নালি সৃষ্টি হয়ে প্রত্যেক শুক্রাশয়ের শীর্ষদেশ থেকে শুক্রাশয় ত্যাগ করে এপিডিডাইমিসে মিলিত হয়। সংগ্রাহক নালিগুলোকে **ভাসা ইফারেন্সিয়া** (vasa efferentia) বলে।

কাজ : শুক্রাণু মাতৃকোষ থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন করে এবং **টেস্টোস্টেরণ** নামক হরমোন ক্ষরণ করে।

২. এপিডিডাইমিস (Epididymis) : প্রত্যেক শুক্রাশয়ের ভাস ইফারেন্সিয়া একত্রে মিলিত হয়ে একটি করে ৪-৬ মিটার লম্বা অত্যন্ত প্যাঁচানো এপিডিডাইমিস গঠন করে। এর শেষ অংশটি সোজা হয়ে ভাস ডিফারেন্সে মিলিত হয়।

কাজ : এপিডিডাইমিস শুক্রাণুর ভিতর থেকে তরল ও কঠিন অসার পদার্থ আলাদা করে শুক্রাণুর নিষেক ক্ষমতা বাড়ায় এবং পুষ্টি পদার্থ ক্ষরণ করে শুক্রাণুগুলোকে সতেজ রাখে।

৩. ভাস ডিফারেন্স (Vas deferens) বা **শুক্রনালি** : প্রতিটি এপিডিডাইমিস প্রায় ৪০-৫০ সেন্টিমিটার লম্বা, বড় গহ্বর ও মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট একেকটি ভাস ডিফারেন্স-এ উন্মুক্ত হয়। ভাস ডিফারেন্স শ্রোণীগহ্বরে প্রবেশ করে এবং মূত্রথলির উপর বেঁকে অবস্থান করে। মূত্রনালি অতিক্রম করার পর **অ্যাম্পুলা** (ampulla) নামক একটি মাকু আকৃতির ফোলা অংশ গঠন করে। অ্যাম্পুলা পরে সেমিনাল ভেসিকলে যুক্ত হয়।

কাজ : ভাস ডিফারেন্সের প্রধান কাজ হচ্ছে সঙ্গমের সময় দ্রুত শুক্রাণু পরিবহন। কিছু সময়ের জন্য শুক্রাণু জমা রাখাও এর কাজ ।

৪. সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vesicle) : সেমিনাল ভেসিকল হচ্ছে মূত্রথলির নিম্নপ্রান্ত ও মলাশয়ের মাঝখানে অবস্থিত একজোড়া ছোট, আঙ্গুলের মতো কোঁচকানো থলিকা। প্রত্যেক থলিকা একেকটি প্যাঁচানো নালিকায় গঠিত ও যোজক টিস্যুতে আবৃত।

কাজ : বীর্য বা **সিমেন** (semen) উৎপন্নের জন্য বিপুল পরিমাণ পিচ্ছিল থকথকে পদার্থ ক্ষরণ করে। ক্ষরণের ফ্রুক্টোজ সচল শুক্রাণুর শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

৫. ক্ষেপন নালি (Ejaculatory duct) : প্রত্যেক সেমিনাল ভেসিকল থেকে সৃষ্ট একটি করে খাটো নালি প্রত্যেক ভাস ডিফারেন্সের সাথে একীভূত হয়ে একটি করে ০.৩ মিলিমিটার ব্যাসের ১৯ মিলিমিটার লম্বা অভিন্ন ক্ষেপন নালি গঠন করে। এরা দুটি চেরাছিদ্র পথে ইউরেথ্রার প্রস্টেটিক অংশে মুক্ত হয়।

কাজ : ক্ষেপন নালি সেমিনাল থলিকার ক্ষরণসহ শুক্রাণুকে ইউরেথ্রায় পৌঁছে দেয়।

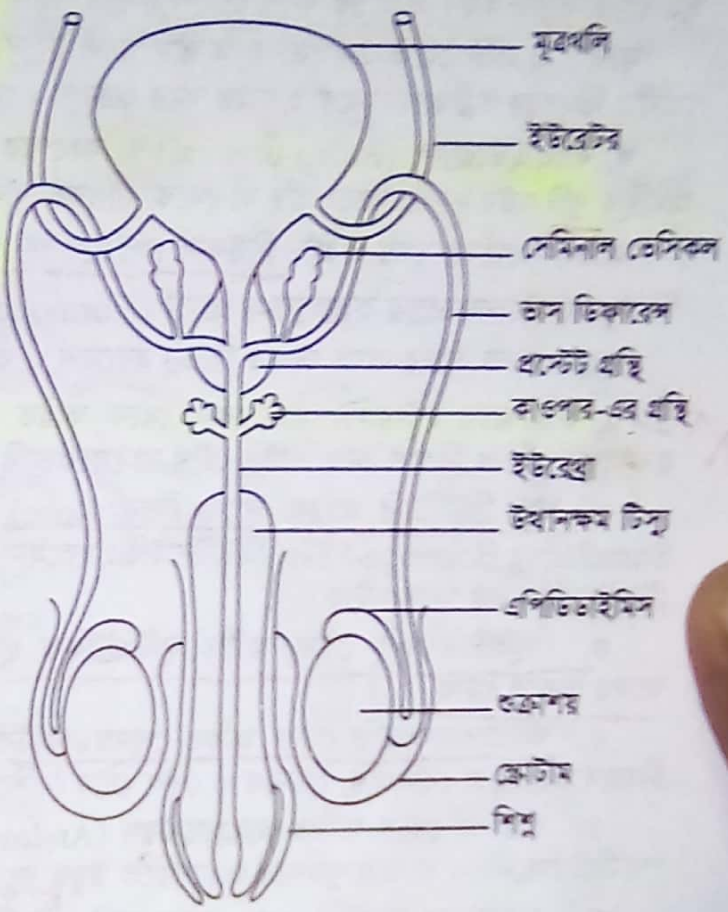

চিত্র ৯.১ : পুংজননতন্ত্র

৬. ইউরেথ্রা (Urethra) : এটি রেচনতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্রের একটি সাধারণ নালি যা প্রায় ২০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং শিশ্নের শীর্ষদেশে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : এ নালির মাধ্যমে বীর্য বাইরে স্খলিত হয় এবং মূত্র নিষ্কাশিত হয়।

৭. বহিঃযৌনাঙ্গ (External genitalia) : এটি দুরকম, যথা- **স্ক্রোটাম** ও **শিশ্ন**।

ক. স্ক্রোটাম (scroptum) বা **অন্ডথলি** : এটি দুই উরুর মাঝখানে ঝুলে থাকা ও ত্বকে আবৃত থলি বিশেষ। ত্বকের নিচে পাঁচ ধরনের পেশিস্তর ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত থাকে। সবকটি স্তর মিলিত হয়ে যে ব্যবধায়ক নির্মাণ করে সেটি স্ক্রোটামের গহ্বরকে দুভাগে ভাগ করে। প্রত্যেক ভাগ একটি করে শুক্রাশয় ও তার এপিডিডাইমিস এবং শুক্রাণুর কিছু অংশ ধারণ করে।

কাজ : স্ক্রোটাম শুক্রাণু উৎপন্নের অনুকূল তাপমাত্রা রক্ষা করে। এছাড়া শুক্রাশয়কে চাপজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। চাপের মুখে শুক্রাশয় থলির ভিতর সহজেই পিছলে যেতে পারে।

খ. শিশ্ন (Penis) বা **পুরুষাঙ্গ** : শিশ্ন হচ্ছে পুরুষের এমন একটি বহিরাঙ্গ যার ভিতর দিয়ে ইউরেথ্রা অতিক্রম করে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এর ত্বকের নিচে চর্বি নেই কিন্তু পাতলা টিস্যু আছে। তাই শিশ্নের ত্বক এত আলগা। যে অংশ থেকে শিশ্ন উঠেছে তাকে **শিশ্নমূল** (root) বলে। সেখানে কয়েক গোছা চুল থাকে। শিশ্নের যে অংশ ঝুলে থাকে, সেটি

শিশ্নদেহ। এর ডগায় ব্যাঙের ছাতা আকৃতির লাল মুন্ডিকে **গ্লান্স পেনিস** (glans penis) বলে। এতে সবচেয়ে বেশি স্নায়ু প্রান্তদেশ উন্মুক্ত। এ মুন্ডিকে যে চামড়া ঢেকে রাখে, তাকে **প্রীপিউস** (prepuce) বলে (মুসলমান পুরুষে এ অংশটি মুসলমানির সময় কেটে ফেলা হয়)। শিশ্নদেহ দুধরনের **ইরেকটাইল** (erectile) টিস্যুতে গঠিত। এ টিস্যু দৃঢ় হলে শিশ্ন প্রসারিত হয়।

কাজ : প্রজনন ক্রিয়ায় দৃঢ় ও প্রসারিত হয়ে এটি ইউরেথ্রার মাধ্যমে বীর্য স্ত্রী জননতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রেরণ করে।

৮. জনন গ্রন্থি : মানুষের জননতালি সংশ্লিষ্ট নিচে বর্ণিত দুটি গ্রন্থি পাওয়া যায়।

ক. প্রস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland) : এটি শ্রোণীগহ্বরে মূত্রথলির নিচে অবস্থিত নাশপাতি আকৃতির গ্রন্থি এবং গোড়া ও চূড়ায় বিভক্ত। এটি পেশল ও গ্রন্থিময় টিস্যুতে গঠিত। গ্রন্থিময় টিস্যু কতকগুলো খন্ডযুক্ত। খন্ডগুলোর নালিকা ইউরেথ্রায় উন্মুক্ত হয়। এ গ্রন্থির ক্ষরণ পেশল টিস্যুর সংকোচনে ইউরেথ্রায় মুক্ত হয়।

কাজ : এ গ্রন্থি থেকে একধরনের ক্ষারীয় তরল নি:সৃত হয় যা বীর্যরসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এ তরল যোনীর ভিতরের অম্লীয় অবস্থাকে প্রশমিত করে শুক্রাণুকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে।

খ. বাল্বোইউরেথ্রাল (Bulbo-urethral) বা **কাওপার-এর গ্রন্থি** (Cowper's gland) : এরা ইউরেথ্রার দুপাশে অবস্থিত দুটি মটর দানার মতো গ্রন্থি যা থেকে নালিকা বেরিয়ে ইউরেথ্রায় মিলিত হয়।

কাজ : সংগমের সময় এ গ্রন্থি **মিউকাস** (পিচ্ছিল পদার্থ) ক্ষরণ করে।

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Action of Male Reproductive System)

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন হরমোন ও তাদের কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ থেকে ক্ষরিত **টেস্টোস্টেরণ** (testoterone) হরমোন মুখ্য ও আনুষঙ্গিক জননাঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং বিভিন্ন গৌণ বা সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

২. অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখ লোব (lobe) থেকে ক্ষরিত **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (Follicle Stimulating Hormone-FSH) লিউটিনাইজিং হরমোন (Luteinising Hormone-LH) এর প্রভাবে যৌন হরমোন টেস্টোস্টেরণ এর ক্ষরণ ঘটায়।

৩. পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **লুটিওট্রফিক হরমোন** (Luteotrophic Hormone—LTH) গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটায়।

৪. অ্যাডরেনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **গোনাডোকর্টিকয়েড** (Gonadocorticoids) হরমোন ভ্রূণের যৌন বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যৌনগ্রন্থি, যৌনাঙ্গ ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

৫. শুক্রাশয় থেকে ক্ষরিত **অ্যান্ড্রোস্টেরণ** (Androsterone) পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং স্পার্মাটোজেনেসিস বা শুক্রাণুজননে শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে।

৬. শুক্রাশয়ের সারটলি কোষ থেকে ক্ষরিত **ইনহিবিন** (Inhibin) ও অল্প পরিমাণ **ইস্ট্রোজেন** (Estrogen) হরমোন শুক্রাণু তৈরিতে সাহায্য করে।

খ. স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (Female Reporoductive System)

মানুষের স্ত্রী প্রজননতন্ত্র নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. ডিম্বাশয় (Ovary) : শ্রোণীর পেছনে ফাঁপা গহ্বরে জরায়ুর দুপাশে ইউরেটারের নিচে বাদাম আকৃতির একজোড়া ডিম্বাশয় অবস্থিত। প্রত্যেক ডিম্বাশয় ৩–৫ সেন্টিমিটার লম্বা, ২–৩ সেন্টিমিটার চওড়া ও ০.৬-১.৫ সেন্টিমিটার পুরু এবং জরায়ু ও ফেলোপিয়ান নালিসহ উদরে একটি পেরিটোনিয়াম পর্দার ভাঁজ করা টিস্যুর সাহায্যে আটকে থাকে। এদের ওজন ২.০–৩.৫ গ্রাম।

কাজ : ডিম্বাণু উৎপন্ন করা ডিম্বাশয়ের প্রধান কাজ। তাছাড়া স্ত্রী যৌন হরমোন–ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণ ক্ষরণ করে থাকে। এসব হরমোনের প্রভাবে রজঃচক্র, গর্ভ, অমরা, জননেন্দ্রিয়, মাতৃস্তন পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

২. ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান নালি (Fallopian tube) : এরা জরায়ুর দুপাশে অবস্থিত দুটি পেশল ও সেন্টিমিটার লম্বা নালি। নালির একপ্রান্ত ডিম্বাশয়ের কাছে পেরিটোনিয়াল গহ্বরে ও অন্যপ্রান্ত জরায়ু-গহ্বরে উন্মুক্ত। ডিম্বাশয় সংলগ্ন প্রান্তটি অসংখ্য আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধনযুক্ত হয়ে ঝালর বা **ফিমব্রি** (fimbriae)-তে পরিণত হয়। ফানেলাকার অংশটি **ইনফান্ডিবুলাম** (infundibulum)। এর স্ফীত অংশ **অ্যাম্পুলা** (ampulla) এবং যে মধ্য অংশ জরায়ু-প্রাচীরের কাছে থাকে তা **ইসথমাস** (isthmus)।

কাজ : ডিম্বনালি ডিম্বাশয় থেকে মুক্ত পরিণত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করে জরায়ুতে পৌঁছে দেয় এবং রস ক্ষরণ করে শুক্রাণুকে ঊর্ধ্বপ্রান্তে উঠে ডিম্বাণুকে নিষিক্তকরণে সাহায্য করে।

৩. জরায়ু (Uterus) : এটি দেখতে উল্টানো নাশপতির মতো, ফাঁপা, মাংসল অঙ্গ এবং মূত্রাশয়ের পেছনে ও মলাশয়ের সামনে শ্রোণীগহ্বরে অবস্থিত। জরায়ু-প্রাচীর বহিঃস্থ **পেরিমেট্রিয়াম** (perimetrium), মধ্যস্থ **মায়োমেট্রিয়াম** (myometrium) এবং অন্তঃস্থ **এন্ডোমেট্রিয়াম** (endometrium)-এ গঠিত। জরায়ুর উপরের অংশকে **জরায়ুদেহ** (body of uterus) এবং নিচের অংশকে **সারভিক্স** (cervix) বলে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে জরায়ু পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু গর্ভাবস্থায় এটি প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

কাজ : জরায়ু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভ্রূণকে আগলে রক্ষা করে এবং পরিস্ফুটন সম্ভবপর করে তোলে। এখান থেকে অমরা সৃষ্টি হয়ে ভ্রূণের পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন সম্পন্ন করে। শুক্রাণুর আগমনকে ত্বরান্বিত করে। সারভিক্সের (জরায়ুকণ্ঠের) নিঃসৃত ক্ষারকীয় রস শুক্রাণুর চলৎশক্তি বৃদ্ধি করে।

৪. যোনি (Vagina) : এটি শুক্রাণু গ্রহণের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রীদেহের একটি মাংসল, ৮-১০ সেন্টিমিটার লম্বা নলাকার খাদ যা মূত্রাশয়ের নিচ দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত জরায়ু থেকে বাইরে উন্মুক্ত। যোনির প্রাচীরে **বলী** (rugae) নামক অসংখ্য ভাঁজ থাকে।

কাজ : যোনি মাংসল প্রাচীরের সাহায্যে যে কোনো শিশ্নকে গ্রহণ করে। বীর্য স্খলনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রদান করে। স্খলিত বীর্য গ্রহণ করে এবং প্রসব মুক্ত করে।

৫. বহিঃযৌনাঙ্গ (External genitalia) : এগুলো যোনিমুখে অবস্থিত সংবেদী স্নায়ুপ্রান্তসমৃদ্ধ দুটি মাংসল ভাঁজ ও ভগাংকুর। ভাঁজদুটি কপাটের মতো যোনিপথকে ঢেকে রাখে। এদের একটি বড় ও একটি ছোট, এবং যথাক্রমে **লেবিয়া মেজরা** (labia majora) ও **লেবিয়া মাইনরা** (labia minora)নামে পরিচিত। দুই লেবিয়া মেজরার সন্ধিস্থলের উপরের অংশের ভিতর মেদ টিস্যু থাকায় ঐ অংশ বেশ উঁচু এবং চুলে ভরা থাকে। এ উঁচু অংশকে **মন্স ভেনেরিস** বা **মন্স পিউবিস** বলে। লেবিয়া মেজরার একেবারে উপরে জোড়ের কাছে যে উঁচু ছোট মাংসপিন্ড দেখা যায়, তাকে **ক্লাইটোরিস** (clitoris) বা **ভগাংকুর** বলে। যোনি ও ইউরেথ্রা এখানে উন্মুক্ত হয়। ইউরেথ্রার চারদিকে এবং ক্লাইটোরিসের উপরে কতকগুলো ক্ষুদ্র গ্রন্থি অবস্থিত। লেবিয়া মাইনরা-র অন্তর্তলে **বার্থোলিন-এর গ্রন্থি** নামে দুটি বড় গ্রন্থি উন্মুক্ত হয়েছে।

চিত্র ৯.২ : স্ত্রীপ্রজননতন্ত্র (সম্মুখ দৃশ্য)

কাজ : লেবিয়া মেজরা ও মাইনরা যোনিদ্বারকে ঢেকে রাখে। বার্থোলিন-এর গ্রন্থিক্ষরণ যৌনমিলনের সময় যোনিপথকে পিচ্ছিল করে তোলে। ক্লাইটোরিস যৌনমিলনকে আনন্দঘন করে তোলে।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Action of Female Reproductive System)

মানুষের স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের কার্যাবলি বিভিন্ন ধরনের হরমোনের ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের কিছু হরমোন সরাসরি জনন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং কিছু হরমোন অন্য হরমোনের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। সেসব হরমোনের ক্রিয়া দ্বারা মানব স্ত্রীজননতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. ডিম্বাশয়ের কর্পাস লুটিয়ার কোষগুলো **ইস্ট্রোজেন** (oestrogen) ও **প্রোজেস্টেরণ** (progesterone) নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী যৌন হরমোন ক্ষরণ করে। ইস্ট্রোজেন হরমোন স্ত্রী জননাঙ্গের যেমন-স্তনের এবং এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি ঘটায়। এটি স্ত্রী চরিত্রের পরিস্ফুটন এবং পরিণত বয়সে মাসিক বা রজঃচক্র নিয়ন্ত্রণ করে।

ইস্ট্রোজেন হরমোন জরায়ু প্রাচীরকে সংকোচিত করে স্বাভাবিক করে তোলে।

২. প্রোজেস্টেরন ভ্রূণের পরিস্ফুটনের জন্য জরায়ুর ভিতর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৩. পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (FSH) ওভারিয়ান ফলিকলের বৃদ্ধি, ওজেনেসিস ও ইস্ট্রোজেন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৪. পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **লুটিনাইজিং হরমোন** (LH) এর প্রভাবে গ্রাফিয়ান ফলিকল করপাস লুটিয়ামে পরিণত হয়।

৫. অমরা থেকে ক্ষরিত HCG (Human Chorionic Gonadotropin) হরমোনগুলো স্ত্রীজননাঙ্গের বৃদ্ধি, দুগ্ধ ক্ষরণ ও ফিটাসের বর্ধনের জন্য গ্লুকোজ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

৬. ডিম্বাশয় ও অমরা থেকে ক্ষরিত **রিলাক্সিন** (Relaxin) হরমোন মহিলাদের প্রসবের সময় শ্রোণীদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটায়।

MAT

প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা (Different Stages and Phases of Reproduction)

মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। যৌন জনন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ ভিন্নধর্মী গ্যামেট সৃষ্টি ও নিষেকের মাধ্যমে গ্যামেটের একীভবনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট **জাইগোট** (zygote) দ্রুত বিভক্ত হয়ে **ব্লাস্টোসিস্ট** (blastocyst) নামক কোষগুচ্ছে পরিণত হয়। এটি ফেলোপিয়ান নালির ভিতর দিয়ে বাহিত হয়ে **ইমপ্ল্যান্টেশন** (implantation) প্রক্রিয়ায় জরায়ুগাত্রে স্থাপিত হয়ে **গর্ভধারণ** সম্পন্ন হয়। এরপর শুরু হয় ভ্রূণগঠন প্রক্রিয়া। ভ্রূণ গঠনের প্রাথমিক ধাপেই তিনটি ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি হয়। এ তিনটি স্তর থেকেই পরবর্তীতে দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হয়। এ কারণে ভ্রূণের পরিস্ফুটনকালীন দশা মানবজননের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা নিচে বর্ণিত সাতটি শিরোনামের মাধ্যমে বর্ণনা করা যায়। যেমন- ১. **বয়ঃপ্রাপ্তি**, ২. **রজঃচক্র**, ৩. **গ্যামেট সৃষ্টি**, ৪. **নিষেক**, ৫. **ইমপ্ল্যান্টেশন**, ৬. **ভ্রূণের পরিস্ফুটন** এবং ৭. **ভ্রূণের বিকাশ**।

১. বয়ঃপ্রাপ্তি বা বয়ঃসন্ধিকাল (Puberty or Adolescense)

সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের সক্রিয় পরিস্ফুটনকালকে **বয়ঃপ্রাপ্তি বা বয়ঃসন্ধি** বলে। এ সময়টি হচ্ছে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পনের মুহূর্ত। এ কালটি পুরুষে ১৩-১৫ বছরের মধ্যে এবং নারীতে ১২-১৩ বছরের মধ্যে আবির্ভূত হয়। এ সময় বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে দৈহিক গঠন ও চরিত্রে নানান বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। বয়ঃসন্ধিকালের এসব বৈশিষ্ট্যকে **সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য** (secondary sex characters) বলে। বীর্যপাত ও রজঃচক্র যথাক্রমে ছেলে ও মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তির বৈশিষ্ট্যসূচক। নিচের ছকের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো উল্লেখ করা হলো।

পুরুষ ও নারীর বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন

আলোচ্য বৈশিষ্ট্য	পুরুষ	নারী
	দৈহিক পরিবর্তন	
১। লোম	১। মুখ, বগল, শ্রোণীদেশে লোম।	১। বগল ও শ্রোণীদেশে লোম।
২। পেশি	২। বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হয়।	২। তেমন নয়।
৩। মেদ	৩। মুখ ও পেটে সঞ্চিত হয়।	৩। কোমর ও নিতম্বে সঞ্চিত হয়।
৪। স্তন	৪। প্রায় স্বাভাবিক থাকে।	৪। প্রচুর মেদ সঞ্চিত হয়ে সুডৌল ও উন্নত হয়।
৫। কণ্ঠস্বর	৫। গাঢ়, ভারী ও গম্ভীর হয়ে উঠে।	৫। মেয়েলী স্বর প্রকাশ পায়।
	শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন	
১। হৃৎপিণ্ডের গতি ও রক্তচাপ	১। বৃদ্ধি পায়।	১। বৃদ্ধি পায়।
২। শ্বাস-প্রশ্বাস	২। গভীর হয়।	২। গভীর হয়।
৩। মৌল বিপাকীয় হার	৩। বৃদ্ধি পায়।	৩। হ্রাস পায়।
৪। লোহিত রক্তকণিকা	৪। অনেক বৃদ্ধি পায়।	৪। কিছু পরিমাণ হ্রাস পায়।
৫। জননাঙ্গের হরমোন	৫। উৎপন্ন ও ক্ষরিত হতে থাকে।	৫। উৎপন্ন ও ক্ষরিত হতে থাকে।
৬। জননকোষ	৬। শুক্রাণুসহ বীর্য উৎপন্ন ও স্খলিত হয়।	৬। রজঃচক্র আরম্ভ হয়।
৭। আনুষঙ্গিক জনন অঙ্গ	৭। সুগঠিত ও কার্যক্ষম হয়ে উঠে।	৭। সুগঠিত ও কার্যক্ষম হয়ে উঠে।
	মানসিক পরিবর্তন	
১। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ	১। নারীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।	১। পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।
২। ভাব	২। বিচিত্র খেয়াল ও ভাব মনে জেগে উঠে।	২। নারীসুলভ মানসিকতার প্রকাশ ঘটে।

২. রজঃচক্র (Menstrual cycle)

বয়োপ্রাপ্ত নারীর সমগ্র যৌনজীবনে প্রায় নিয়মিত, গড়ে ২৮ দিন (২৪–৩২ দিন) পরপর জরায়ু থেকে রক্ত, মিউকাস, এন্ডোমেট্রিয়ামের ভগ্নাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিষিক্ত ডিম্বাণুর চক্রীয় নিষ্কাশনকে **রজঃচক্র** বলে। গোনাডোট্রফিক হরমোন (GTH)-এর প্রভাবে ১২–১৫ বয়সে এ চক্রের সূত্রপাত ঘটে এবং ৪৫–৫০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

রজঃচক্রকালে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম (অন্তঃস্তর)-এর পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে রজঃচক্রকে নিচে বর্ণিত ৪টি পর্বে ভাগ করা হয়ে থাকে।

ক. নিরাময় পর্ব (Regenerative/Repairing/Resting phase) : বিগত রজঃচক্র শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী চক্রের প্রারম্ভে জরায়ুতে যে প্রক্রিয়ায় পুনর্গঠনমূলক কাজ শেষে এন্ডোমেট্রিয়াম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তাকে **নিরাময় পর্ব** বলে। এর স্থায়িত্বকাল **রজঃস্রাব শুরুর তিন দিন পর থেকে ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত**। এসময় সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে FSH (ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন) ও LH (লুটিনাইজিং হরমোন)-এর ক্ষরণ সামান্য বৃদ্ধি পায়, ডিম্বাশয়ে ফলিকলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং এন্ডোমেট্রিয়াম ১ মিমি. পুরু হয়।

খ. বৃদ্ধি পর্ব (Proliferative phase) : রজঃচক্রের যে পর্বে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ডিম্বাশয় থেকে সেকেন্ডারী উওসাইট নিষেকের উদ্দেশে বিচ্ছিন্ন হয় (ডিম্বপাত), তাকে **বৃদ্ধিপর্ব** বলে। এ পর্বের স্থায়িত্বকাল **৭ম থেকে ১৪তম দিন পর্যন্ত**। এ সময় বর্ধনশীল ফলিকলের ফলিকল কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ এস্ট্রোজেন হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং এতে বিদ্যমান নলাকার গ্রন্থি ও রক্তনালি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এন্ডোমেট্রিয়াম প্রায় ৩–৪ মি.মি. পুরু হয়, FSH ও LH-এর ক্ষরণ বন্ধ করে দেয় (সম্মুখ পিটুইটারির মাধ্যমে) এবং ডিম্বাশয়ের ফলিকল ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠে।

চক্রের ১২তম দিনে হঠাৎ LH-এর ক্ষরণ বেড়ে যায় এবং এস্ট্রোজেনের ক্ষরণ কমে যায়। ১৪ দিনের মাথায় (চক্র যদি ২৮ দিনের হয়) পরিণত ফলিকল থেকে ডিম্বপাত ঘটে। ডিম্বপাতের পর ফলিকলের বাকি কোষগুলো LH-এর প্রভাবে একত্রে **কর্পাস ল্যুটিয়াম** (corpus luteum) নামক এক বড়, হলদে বস্তুতে পরিণত হয়ে সাময়িকভাবে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে এবং প্রোজেস্টেরণ হরমোন ক্ষরণ করে। এ হরমোনও এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি ও ডিম্বপাতে প্রভাব বিস্তার করে। ডিম্বপাতের পরপরই প্রোজেস্টেরণ ক্ষরণে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

গ. প্রাক-রজঃস্রাবীয় পর্ব (Premenstrual phase): রজঃচক্রের যে পর্বে ব্লাস্টোসিস্ট ধারণের জন্য জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম পূর্ণগঠিত পর্যায়ে অপেক্ষমান থাকে, তাকে **প্রাক-রজঃস্রাবীয় পর্ব** বলে। এ পর্বের স্থায়িত্বকাল রজঃচক্রের

ভ্রূণীয় স্তর	পরিণত মানুষে গঠিত কলা
এক্টোডার্ম	• ত্বক ও ত্বকোদ্ভূত অঙ্গাদির (ঘর্ম গ্রন্থি, তেল গ্রন্থি, স্তনগ্রন্থি, চুল, নখ) এপিডার্মিস। • ঠোঁট, মুখবিবর, জিহ্বা ও পায়ুছিদ্রের অন্তঃআবরণ বা এপিথেলিয়াল আবরণ। • চোখের রেটিনা, কর্নিয়া ও লেন্স এবং অন্তঃকর্ণের মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ। • পিটুইটারি গ্রন্থি ও পিনিয়াল গ্রন্থির এপিথেলিয়াম আবরণ, বৃক্কের মেডুলা। • স্নায়ুতন্ত্র ও সংবেদী অঙ্গসমূহ, দাঁতের এনামেল।
মেসোডার্ম	• ত্বকের ডার্মিস। • নটোকর্ড, মেরুদণ্ড, কঙ্কালতন্ত্র, পেশি কলা ও যোজক কলা। • বৃক্কের কর্টেক্স, পাকস্থলি ও অন্ত্রের পেশিকলা। • দাঁতের ডেন্টিন ও চোখের বিভিন্ন অংশ। • রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র, রক্তসংবহনতন্ত্র, লসিকা গ্রন্থি ও লসিকা। • দেহগহ্বরের অন্তঃপ্রাচীর।
এন্ডোডার্ম	• পরিপাকনালি অন্তঃআবরণ বা এপিথেলিয়াল আবরণ। • শ্বসনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র, রেচননালি, মূত্রনালি ও মূত্রথলির এপিথেলিয়াল আবরণ। • মধ্যকর্ণ, টনসিল, থাইমাস, থাইরয়েড ও প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি। • গলবিল, অন্ননালি, পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়।

১৫-২৮তম দিন পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৩-১৪ দিন)। এ পর্বে কর্পাস লুটিয়ামের কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রোজেস্টেরণ ও অল্প পরিমাণ এস্ট্রোজেন ক্ষরণ অব্যাহত থাকে। প্রোজেস্টেরণের প্রভাবে এন্ডোমেট্রিয়াম আরও রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ হয়, এর কোষগুলোতে পুষ্টি পদার্থ (গ্লাইকোজেন ও লিপিড) বেড়ে যায়। পরিশেষে এন্ডোমেট্রিয়াম ৫-৬ মিমি. পুরু হয়ে ব্লাস্টোসিস্টের ধারণ ও পোষণে সক্ষম হয়।

ঘ. রজঃস্রাবীয় বা ব্লিডিং পর্ব (Menstrual / Destructive / Bleeding phase) : ডিম্বপাতের পর **ডিম্বাণু ৩৬ ঘন্টার মধ্যে নিষিক্ত না হলে** কর্পাস লুটিয়াম থেকে নিঃসৃত এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণের প্রভাবে সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি FSH ও LH ক্ষরণ বন্ধ করে দেয়। LH (লুটিনাইজিং হরমোন)-এর অভাবে কর্পাস লুটিয়ামের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে বিস্তৃত হয়। চক্রের এ পর্বে ৪টি হরমোনের (এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরণ, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ও লুটিনাইজি হরমোন) ক্ষরণ মাত্রাই নিম্নতম পর্যায়ে থাকে।

এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণের ক্ষরণমাত্রা কমে যাওয়ায় এন্ডোমেট্রিয়ামের আর বৃদ্ধি ঘটে না, বরং তা ভাঙতে শুরু করে। রক্তের অভাবে তখন এন্ডোমেট্রিয়ামের ধমনিকুন্ডলী প্রসারিত হয়, ফলে ধমনিকা ও কৈশিকজালিকা ছিন্নভিন্ন হলে **রক্তক্ষরণ** শুরু হয়। পরে অবশ্য কিছু রক্তবাহিকার সংকোচনে স্থানীয় রক্তপাত বন্ধ হয়, কিন্তু অন্যান্য রক্তবাহিকার অক্ষমতার জন্য রক্তক্ষরণ ৪-৫ দিন স্থায়ী হয়। এ সময় রক্তের সাথে এন্ডোমেট্রিয়াম, রক্তবাহিকার ভগ্নাংশ ও অনিষিক্ত ডিম্বাণু যোনিপথে নিষ্কাশিত হয়। এসব পদার্থকে **রজঃস্রাব** বলে। প্রত্যেক রজঃস্রাবের পরিমাণ ৩০-৪০ মিলিলিটার।

এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণমাত্রা অনেক নিচে নেমে গেলে সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির উপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায়, তখন আবার FSH ও LH ক্ষরণ শুরু হয়। সে সাথে শুরু হয় নতুন রজঃচক্র সৃষ্টির তৎপরতা।

রজঃচক্রের তাৎপর্য : রজঃচক্র মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতার সূচনা ঘটায়। স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণক্ষমতা নির্দেশ করে এটি প্রতিমাসে একবার গর্ভসঞ্চারনের সুযোগ সৃষ্টি করে। নিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের প্রজননিক সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ। অনিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের বিভিন্ন শারীরিক ও যৌন সমস্যা সৃষ্টি করে।

৩. গ্যামেট সৃষ্টি (Formation of Gamates) বা গ্যামেটোজেনেসিস (Gametogenesis)

যেসব প্রাণী যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে সেসব ক্ষেত্রে কেবল **নিষেক** - এর পর পরিস্ফুটন শুরু হয়। নিষেকের জন্য একটি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু অত্যাবশ্যক, যা সাধারণত একটি প্রজাতির পরিণত বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী সদস্য সৃষ্টি করতে সক্ষম।

যে প্রক্রিয়ায় জনন অঙ্গের (শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়) প্রিমর্ডিয়াল জননকোষ (জনন মাতৃকোষ) থেকে গ্যামেট (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) উৎপন্ন হয়ে নিষেকে সক্ষম হয়ে উঠে তাকে **গ্যামেটোজেনেসিস** (গ্রিক *gamos* = জননকোষ এবং *genesis* = উৎপত্তি হওয়া) বলে। শুক্রাণু উৎপন্নের প্রক্রিয়াকে **শুক্রাণুজনন** বা **স্পার্মাটোজেনেসিস** এবং ডিম্বাণু উৎপন্নের প্রক্রিয়াকে **ডিম্বাণুজনন** বা **উওজেনেসিস** বলা হয়।

নিচে স্পার্মাটোজেনেসিস এবং উওজেনেসিসের ধাপসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো।

ক. শুক্রাণুজনন বা স্পার্মাটোজেনেসিস

পূর্ণাঙ্গ শুক্রাণু তৈরি হওয়ার পদ্ধতিকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** (spermatogenesis; গ্রিক *sperma*=শুক্রাণু + *genesis* = জনন বা সৃষ্টি) বলা হয়। পুরুষ জননাঙ্গে অর্থাৎ শুক্রাশয়ে প্রক্রিয়া ঘটে। মেরুদন্ডী প্রাণিদের শুক্রাশয় অসংখ্য **সেমিনিফেরাস নালিকা** (seminiferous tubules)-য় গঠিত। এসব নালিকার প্রাচীর **জার্মিনাল এপিথেলিয়াম** নামক আবরণী কোষে আবৃত থাকে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এসব এপিথেলিয়ামের প্রতিটি কোষ প্রচ্ছন্নভাবে শুক্রাণুতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম। তবে সব কোষ স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। যেসব কোষ এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

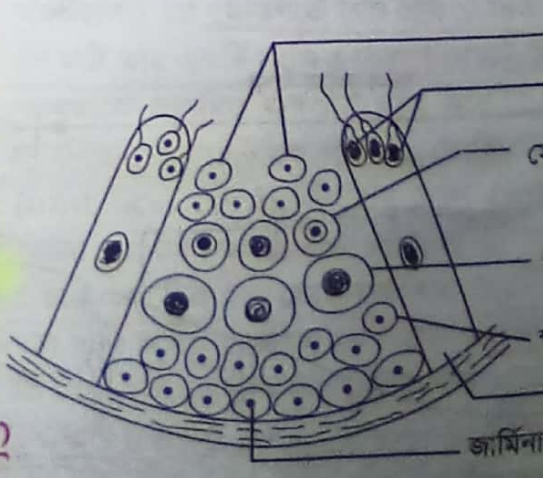

চিত্র ৯.৪ : শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদের একাংশ বিবর্ধিত

করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শুক্রাণু গঠন করে সেগুলোকে **প্রিমর্ডিয়াল জননকোষ** (primordial germ cell) বা **জনন মাতৃকোষ** বলে। অবশ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে জার্মিনাল কোষগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেহকোষও দেখা যায়। এগুলোকে **সারটলি কোষ** (sertoli cell) বলে। এরা বৃদ্ধিশীল শুক্রাণুকে পুষ্টি সরবরাহ করে।

নিচে স্তন্যপায়ী প্রাণীর (মানুষ) স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো। ক্রমবর্ধনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিচে বর্ণিত চারটি ধাপে ভাগ করা যায়।

i. **সংখ্যাবৃদ্ধি** (Multiplication) : শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকার **জার্মিনাল এপিথেলিয়াল কোষ** (germinal epithelial cell, 2n) বার বার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। উৎপন্ন কোষগুলোকে **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia, একবচনে-spermatogonium) বলে। স্পার্মাটোগোনিয়ামকে (2n) **শুক্রাণু মাতৃকোষ** (sperm mother cell)-ও বলা হয়।

ii. **পরিবর্ধন** (Growth) : প্রতিটি স্পার্মাটোগোনিয়াম সেমিনিফেরাস নালিকার **সার্টলি কোষ** (sertoli cell) থেকে খাদ্য শোষণ করে আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষগুলোকে **প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট** (primary spermatocyte) বলে। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াস আয়তনে বেশ বড় এবং ক্রোমোজোমগুলোতে মিয়োসিসের ইন্টারফেজ দশার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

iii. **পূর্ণতাপ্রাপ্তি** (Maturation) : এ দশায় প্রতিটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (2n) মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি **স্পার্মাটিড** (spermatid) বা অপরিণত শুক্রাণু (n) উৎপন্ন করে।

iv. **স্পার্মিওজেনেসিস** (Spermiogenesis) : যে প্রক্রিয়ায় চলাচলে অক্ষম, গোলাকার স্পার্মাটিড ইক ও সম্পূর্ণ আঙ্গিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, আর কোন ন ছাড়াই সচল শুক্রাণুতে পরিণত হয় তার নাম **স্পার্মিওজেনেসিস**। প্রথমে স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসটি পানি, RNA ও নিউক্লিয়াস পরিত্যাগ করে সঙ্কুচিত হয় এবং শুক্রাণুর মাথা গঠন করে। স্পার্মাটিডে গলজি বডি থেকে **অ্যাক্রোসোম** (acrosome) সৃষ্টি হয়ে শুক্রাণুর মাথায় টুপির মতো অবস্থান করে। স্পার্মাটিডের সেন্ট্রিওল শুক্রাণুর অক্ষীয় সূত্রক ও লেজ গঠন করে। এভাবে স্পার্মাটিড পরিবর্তিত হয়ে সচল, লম্বাকৃতির ও প্রায় সাইটোপ্লাজম বিহীন শুক্রাণুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৬০-৭০ দিন সময় লাগে।

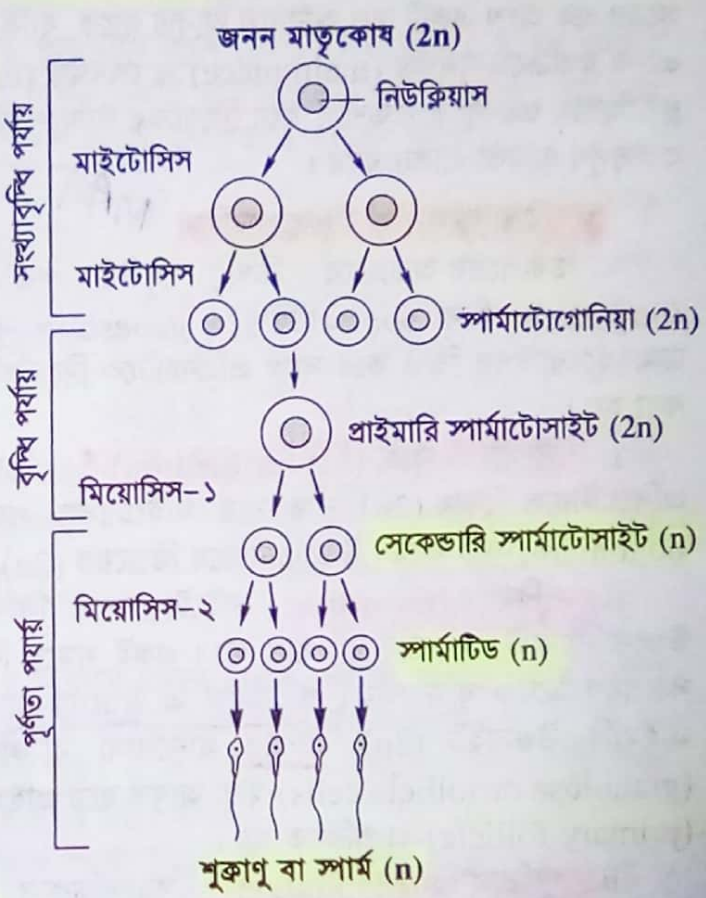

চিত্র ৯.৫ : স্পার্মাটোজেনেসিস এর ধাপসমূহ

মানুষের শুক্রাণুর গঠন (Stucture of Human sperm)

একটি শুক্রাণুদেহ নিচে বর্ণিত চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত। এসব অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ।

i. **মাথা** : মাথা হচ্ছে শুক্রাণুর সামনের অংশ যা দেখতে স্ফীতকায়, কোণাকৃতি বা লেন্সের মত। শুক্রাণুর সম্পূর্ণ মাথা একটি পাতলা সাইটোপ্লাজমীয় স্তরে আবৃত থাকে। মাথার সাইটোপ্লাজমের অধিকাংশ জুড়ে থাকে একটি ডিম্বাকৃতি **নিউক্লিয়াস**। এতে ক্রোমোজোম (n সংখ্যক) থাকায় পিতার বংশগতি সন্তানে সঞ্চারিত হয়। এর সামনের অর্ধেক অংশের উপরে নিউক্লিয়াসকে ঢেকে থাকে **অ্যাক্রোসোম**। অ্যাক্রোসোম একটি থলি বিশেষ। অ্যাক্রোসোমে উপস্থিত টিস্যু গলনকারী এনজাইমসমূহ ডিম্বাণুর ঝিল্লি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশে সাহায্য করে।

চিত্র ৯.৬ : মানুষের শুক্রাণু (ফটো-মাইক্রোগ্রাফ)

ii. **গ্রীবা** (Neck) : গ্রীবা হচ্ছে শুক্রাণুর মাথার ঠিক পেছনে মাথা ও মধ্যখণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত একটি সরু, স্বচ্ছ সংযোগস্থল। এখানে পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটি **সেন্ট্রিওল** থাকে।

iii. **মধ্য খণ্ড** (Middle piece) : সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং অক্ষীয় সূত্রে গঠিত অংশটি হচ্ছে শুক্রাণুর মধ্য খণ্ড। এর মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়ার অংশই বেশি। মাইটোকন্ড্রিয়া ফ্ল্যাজেলাম সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়।

iv. **লেজ বা ফ্ল্যাজেলাম** (Tail or Flagellum) : শুক্রাণুর মধ্যখণ্ডের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়া সমাপ্তির অংশ থেকে শুরু করে পেছনের সবটুকুই লেজ বা ফ্ল্যাজেলাম। এটি শুক্রাণুর দীর্ঘতম অংশ। এতে অক্ষীয় সূত্রের এক অংশ একটি স্থূল আবরণে আবৃত থাকে, বাকি অংশ থাকে অনাবৃত। এদের যথাক্রমে **মূলখণ্ড** (main piece) ও **শেষখণ্ড** (end piece) বলা হয়। ফ্ল্যাজেলাম শুক্রাণুকে গতিশীল করে নিষেকের উদ্দেশে ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চিত্র ৯.৭ : মানুষের শুক্রাণুর গঠন

খ. ডিম্বাণুজনন বা উওজেনেসিস

ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু সৃষ্টির পদ্ধতিকে **উওজেনেসিস** (oogonesis; গ্রিক *oon* =ডিম্বাণু + *genesis* = সৃষ্টি বা জনন) বলে। ক্রমবর্ধনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিচে বর্ণিত চারটি ধাপে ভাগ করা হয়।

i. **সংখ্যা বৃদ্ধি** (Multiplication) : ডিম্বাশয়ের জার্মিনাল এপিথেলিয়াল কোষ (2n) বার বার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে **উওগোনিয়া** (oogonia, একবচনে oogonium) সৃষ্টি করে। উওগোনিয়ামে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

ii. **পরিবর্ধন** (Growth) : সাইটোপ্লাজমে লিপিড, প্রোটিন ইত্যাদি কুসুম আকারে জমা হওয়ার ফলে উওগোনিয়ামটি আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একই সময়ে নিউক্লিয়াসের আয়তনও বৃদ্ধি পায়। বিপাকীয় কাজসহ প্রোটিন সংশ্লেষণ অনেক বৃদ্ধি পায়। পরিবর্ধিত এ উওগোনিয়ামকে **প্রাইমারি উওসাইট** (primary oocyte) বলে। প্রতিটি প্রাইমারি উওসাইট (2n) একস্তর গ্রানুলোসা বা **ফলিকল কোষ** (granulosa or follicle cells) দ্বারা আবৃত হয়ে **প্রাইমারি ফলিকল** (primary follicle)-এ পরিণত হয়।

iii. **পূর্ণতাপ্রাপ্তি** (Maturation) : বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতি মাসে কিছু প্রাইমারি ফলিকল বৃদ্ধি লাভ করে। এদের মধ্যে সাধারণত একটি পরিপক্ব হয় এবং অবশিষ্টগুলো বিলুপ্ত হয়। পরিপক্ব প্রাইমারি ফলিকলকে **গ্রাফিয়ান ফলিকল** (graffian follicle) বলে। বৃদ্ধিরত প্রাইমারি ফলিকলের অভ্যন্তরস্থ **প্রাইমারি উওসাইট** প্রথম মিয়োটিক বিভাজন দ্বারা দুটি অসম কোষ উৎপন্ন করে। বড় কোষটিকে **সেকেন্ডারি উওসাইট** (secondary oocyte, n) এবং ছোট কোষটিকে ১ম **পোলার বডি** (1st polar body) বলে। ১ম পোলার বডি অতঃপর মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে **দুটি পোলার বডি** তৈরি করে। অপরদিকে, সেকেন্ডারি উওসাইটটি নিষেকের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি উওসাইট অবস্থায় ডিম্বাণু নির্গমন বা **ওভ্যুলেশন** (ovulation) হয়। পরে যখন কোন শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডা ভেদ করে, তখন সেকেন্ডারি উওসাইটে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন সম্পূর্ণ হয়। এ বিভাজনে সেকেন্ডারি উওসাইটটি অসমভাবে বিভাজিত হয়ে একটি বড় হ্যাপ্লয়েড (n)

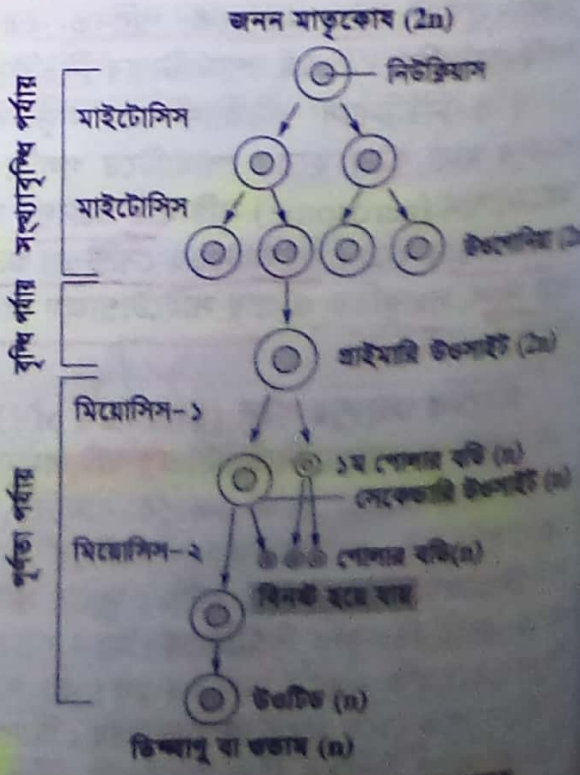

চিত্র ৯.৯ : উওজেনেসিস-এর ধাপসমূহ

উওটিড (ootid) ও একটি ছোট **পোলার বডি** (n) সৃষ্টি করে। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে একটি বৃহৎ উওটিড ও তিনটি ছোট পোলার বডি সৃষ্টি হয়।

iv. **রূপান্তর** : এ পর্যায়ে উওটিড রূপান্তরিত হয়ে **ওভাম** (ovum) বা **ডিম্বাণু**-তে পরিণত হয়। তবে শুক্রাণুর মতো এক্ষত্রে আকৃতি ও আকারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে না। কেবল নিষেকের প্রস্তুতি লাভের জন্য এর ভিতরের বস্তুসমূহের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। **সকল পোলার বডি বিনষ্ট হয়ে পরিত্যক্ত হয়।**

মানুষের ডিম্বাণুর গঠন (Structure of Human ovum or egg)

স্ত্রী জননকোষের নাম **ডিম্বাণু**। এটি মোটামুটি গোলাকার এবং ১০৪–১২০ মাইক্রোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট। ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকলের **উওসাইট** (oocyte) বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পরিপক্ক ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। প্রতিটি পরিপক্ক ডিম্বাণুকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা : ডিম্বাণু ঝিল্লি, নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম।

i. **ডিম্বাণু ঝিল্লি** (Egg membrane) : লিপোপ্রোটিন সমৃদ্ধ প্লাজমামেমব্রেন (ঝিল্লি) দ্বারা ডিম্বাণু আবৃত থাকে। প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে **জোনা পেলুসিডা** (zona pellucida) নামক একটি প্রাইমারি আবরণ বিদ্যমান। প্রাইমারি আবরণীর বাইরে আবার **করোনা রেডিয়েটা** (corona radiata) নামক একটি সেকেন্ডারি আবরণ থাকে।

ii. **উওপ্লাজম** (ooplasm) : ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম উওপ্লাজম নামে পরিচিত। এতে প্রচুর গলজি বডি, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও **কর্টিক্যাল গ্রানিউল** (cortical granule) থাকে। মানুষের ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ অতি সামান্য। কুসুম সাইটোপ্লাজমে সমানভাবে ছড়ানো থাকে। তাই মানুষের ডিম্বাণুকে **মাইক্রোলেসিথাল ডিম্বাণু** (microlecithal egg) বলে।

iii. **নিউক্লিয়াস** (Nucleus) : ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস বেশ বড়, তবে কেন্দ্র থেকে একটু সরে অবস্থান করে। নিষেকের সময় নিউক্লিয়াসটি কেন্দ্রে আসে। নিউক্লিয়াসে প্রচুর RNA ও ২৩টি ক্রোমোজোম থাকে।

চিত্র ৯.৯ : মানুষের ডিম্বাণু

গ্যামেটোজেনেসিস এর তাৎপর্য

যৌন জননে অংশগ্রহণকারী জীব গ্যামেটোজেনেসিসের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্রোমোজোম সংখ্যা ত রাখে। গ্যামেটোজেনেসিস ব্যতীত জেনেটিক ভারসাম্যযুক্ত অপত্য জীব সৃষ্টি সম্ভব হতোনা।

গ্যামেটোজেনেসিসের সময় মিয়োসিস বিভাজন সংঘটিত হয়। এ সময় ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন টিক গঠন বিশিষ্ট জনন কোষ উৎপন্ন হয়, যা জীবজগতে প্রকরণের উদ্ভব ঘটায়।

৩. উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় নিশ্চল ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রচুর সংখ্যক সচল শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। এটি নিষেক ঘটার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে এবং প্রজাতির ধারা অব্যাহত রাখে।

৪. ডিম্বাণুতে সঞ্চিত কুসুম নিষেক পরবর্তী ভ্রূণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়।

৪. নিষেক (Fertilization)

নির্দিষ্ট প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী জননকোষের নিউক্লিয়াসের পরস্পর একীভবনকে **নিষেক** বলে। যৌন প্রজননক্ষম প্রাণিদের জন্য নিষেক অপরিহার্য। নিষেক নিচে বর্ণিত ধরনের হতে পারে।

১. সংঘটন স্থলের ভিত্তিতে নিষেক দুরকম, যথা– **অন্তঃনিষেক** ও **বহিঃনিষেক**।

ক. **অন্তঃনিষেক** (Internal fertilization) : নিষেক যখন প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে জননানালির কোনো অংশে সংঘঠিত হয়, তখন তাকে অন্তঃনিষেক বলে। সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীসহ স্থলে বসবাসকারী অধিকাংশ প্রাণীতে অন্তঃনিষেক ঘটে।

খ. **বহিঃনিষেক** (External fertilization) : নিষেক যখন প্রাণিদেহের বাইরে জলীয় মাধ্যমে সংঘটিত হয়, তখন তাকে বহিঃনিষেক বলে। মাছ, উভচরসহ অধিকাংশ পানিচর প্রাণীতে বহিঃনিষেক ঘটে।

২. গ্যামেটের উৎপত্তিগত দিক থেকে নিষেক দুধরনের, যথা: **স্বনিষেক** ও **পরনিষেক**।

ক. স্বনিষেক (Self fertilization) : কোনো প্রাণীর নিষেক যখন নিজদেহের শুক্রাণুর সাহায্যে সংঘটিত হয়, তখন তাকে স্বনিষেক বলে। যেমন– Playthelminthes পর্বের ফিতাকৃমি, যকৃতকৃমি ইত্যাদির নিষেক।

খ. পরনিষেক (Cross fertilization) : নিষেকের জন্য যখন একই প্রজাতির ভিন্ন সদস্যের শুক্রাণুর প্রয়োজন হয়, তখন তাকে পরনিষেক বলে। যেক্ষেত্রে একটি সদস্য পুরুষ অপরটি স্ত্রী থাকে সেখানে পরনিষেক হয়। যেমন- আরশোলা, ব্যাঙ, মুরগী ও মানুষের নিষেক।

মানবদেহে নিষেক প্রক্রিয়া

মানবদেহে যে নিষেক ঘটে তা প্রকৃতপক্ষে **সেকেন্ডারি উওসাইট** ও **পরিণত শুক্রাণুর** নিউক্লিয়াসের একীভবন। এ প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিম্নরূপ।

i. স্খলিত শুক্রাণুগুলোর অ্যাক্রোসোম থেকে **হায়ালুরোনিডেজ** নামক এনজাইম ক্ষরিত হয়। ডিম্বাণুর চারদিকে অবস্থিত **ফলিকল** কোষগুলো যে সব পদার্থের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে সে সব পদার্থকে এ এনজাইম পরিপাকের মাধ্যমে শুক্রাণুর গমন পথের সৃষ্টি করে।

ii. গমন পথ ধরে শুক্রাণু লেজের সাহায্যে চালিত হয়ে ডিম্বাণুর **জোনা পেলুসিডার** বহির্দেশে এসে পৌঁছে (সেকেন্ডারি উওসাইটের চতুর্দিক ঘিরে অবস্থিত পুরু স্তরকে জোনা পেলুসিডা বলে)। এ স্তরে অবস্থিত বিশেষ সংগ্রাহক প্রোটিনে শুক্রাণুর মস্তকঝিল্লির সংগ্রাহকগুলো বন্ধনের সৃষ্টি করে।

iii. বন্ধনের ফলে উদ্দীপ্ত হয়ে শুক্রাণুমস্তক আরেক ধরনের এনজাইম ক্ষরণ করে। এ এনজাইম জোনা পেলুসিডার অংশকে হজম করে একটি পথের সৃষ্টি করে। এ পথ ধরে শুক্রাণু ডিম্বাণু-ঝিল্লির বহির্তলে এসে পৌঁছায়। এর মস্তকটি ডিম্বাণুর ভিলাই-সমৃদ্ধ প্লাজমামেমব্রেনের সাথে একীভূত হয় এবং ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে।

iv. শুক্রাণু-মস্তক ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশের সাথে সাথে ডিম্বাণুর বহির্দেশে অবস্থিত কর্টিকাল দানা (cortical granules) নামে পরিচিত লাইসোজোমগুলো এনজাইম ক্ষরণ করে। এনজাইমের প্রভাবে জোনা পেলুসিডা পুরু ও শক্ত হয়ে **নিষেক ঝিল্লি** (fertilization membrane) সৃষ্টি করে। ফলে আর কোনো শুক্রাণু নিষেকে অংশ নিতে পারে না। তা ছাড়া, এনজাইমের প্রভাবে জোনা পেলুসিডা শুক্রাণু-গ্রাহক প্রোটিনগুলোও নষ্ট হয়ে যায়, ফলে কোনো শুক্রাণুই আর জোনা পেলুসিডায় যুক্ত হতে পারে না।

v. শুক্রাণু প্রবেশের ফলে সেকেন্ডারি উওসাইটটি উদ্দীপ্ত হয়ে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন (মিয়োসিস-২) ঘটিয়ে পরিণত **ডিম্বাণু** ও **দ্বিতীয় পোলার বডি** সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় পোলার বডি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং শুক্রাণুর লেজ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে মিশে যায়। এ সময় শুক্রাণু-নিউক্লিয়াসে ক্রোমাটিনগুলো ঢিলে-ঢালা হয়ে পড়ে, ফলে নিউক্লিয়াসটি স্ফীত

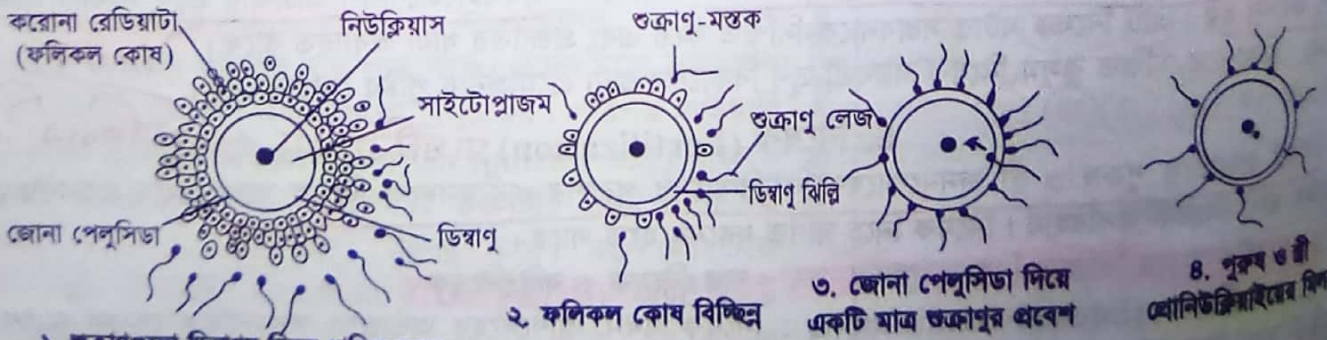

চিত্র ৯.১০ : নিষেকের বিভিন্ন পর্যায়

হয়। এ পর্যায়ে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসকে যথাক্রমে **পুরুষ** ও **স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াই** (male and female pronuclei) বলে।

vi. পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হলে ডিম্বাণুটি ডিপ্লয়েড **জাইগোট** ($n + n = 2n$)-এ পরিণত হয়।

নিষেকের গুরুত্ব বা তাৎপর্য (Significance of fertilization)

যৌন জননকারী প্রাণিদের জন্য নিষেক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে নিষেকের কয়েকটি তাৎপর্য উল্লেখ করা হলো-

১. নিষেক পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করে।
২. নিষেকের ফলে জাইগোটে জিনের নতুন সমন্বয় ঘটে এবং এতে জীবে প্রকরণের সূচনা হয়।
৩. নিষেকের ফলে ডিম্বাণু পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়।
৪. নিষেক জীবের ডিপ্লয়েড সংখ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।
৫. নিষেক ডিম্বাণুর বিপাক হার ও প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে।
৬. নিষেকের মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।
৭. নিষেক জীবের বংশ রক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে।

৫. গর্ভধারণ বা ইমপ্ল্যান্টেশন (Implantation)

নিষেকের পর ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোটটি ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে (স্তন্যপায়ী প্রাণীর জরায়ুর অন্তর্গাত্রে অবস্থিত রক্তবাহিকা ও গ্রন্থিসমৃদ্ধ স্থূল মিউকাস ঝিল্লি) সংস্থাপিত হয় তাকে **গর্ভধারণ** বা **ইমপ্ল্যান্টেশন** বলে।

নারীর ডিম্বাণু ডিম্বনালির (ফেলোপিয়ান নালি) উর্দ্ধপ্রান্তে নিষিক্ত হয়ে জাইগোটে পরিণত হয়। এটি দ্রুত বিভক্ত হয়ে **মরুলা** (morula) নামক একটি নিরেট কোষপুঞ্জের সৃষ্টি করে এবং ডিম্বনালির সিলীয় আন্দোলন ও ক্রমসংকোচনের ফলে নিম্নগামী হয়। জাইগোটের পর্যায়ক্রমিক মাইটোসিস বিভাজনকে **ক্লিভেজ** (cleavage) বলে। নিরেট কোষপুঞ্জটি ডিম্বনালি থেকে সংগৃহীত তরলে পূর্ণ অন্তঃস্থ গহ্বর (ব্লাস্টোসিল) সমন্বিত ও এককোষস্তরীয় **ব্লাস্টোসিস্ট** (blastocyst)-এ পরিণত হয়। ব্লাস্টোসিস্টে প্রায় ১০০টির মতো কোষ থাকে। প্রতিটি কোষকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে। ব্লাস্টোমিয়ারের স্তরকে বলে **ট্রফোব্লাস্ট** (trophoblast)। ৪-৫ দিনের ভিতর ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুতে এসে পৌঁছালে ৭ দিনের মধ্যে এর জোনা পেলুসিডা আবরণ অদৃশ হয়ে যায়। তখন ট্রফোব্লাস্ট কোষ ও জরায়ুর এন্ড্রোমেট্রিয়াম (ভিতরের ষের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট এন্ডোমেট্রিয়ামের যেখানে প্রোথিত হবে সেখানকার আবরণি স্ট থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে বিগলিত হয়। তখন ব্লাস্টোসিস্টটি সেখানে যুক্ত হয়। এভাবে ৬ থেকে ৯ম দিনের মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোটটি ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে আবদ্ধ জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্টের প্রোথিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে **ইমপ্ল্যান্টেশন** বলে।

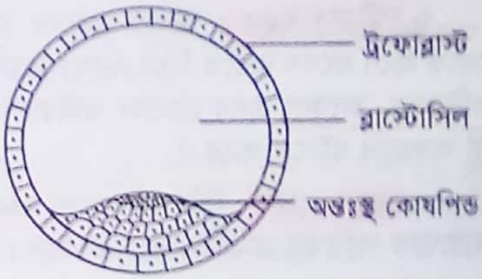

চিত্র ৯.১১ : একটি ব্লাস্টোসিস্ট

অমরা বা প্লাসেন্টা (Placenta)

ভ্রূণীয় ও মাতৃটিস্যুতে গঠিত যে চাকতির মতো গঠন ফিটাস ও মাতৃদেহে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **প্লাসেন্টা** বলে। নিষেকের ১২ সপ্তাহ পরে প্লাসেন্টা গঠিত হয়। [৮ সপ্তাহ পর ভ্রূণ যখন প্রায় মানুষের অবয়ব লাভ করে তখন তাকে **ফিটাস** (fetus) বলে]। ৩য় সপ্তাহে অমরা ও নাভীরজ্জু গঠিত হয়।

প্লাসেন্টায় ফিটাসের অংশ হচ্ছে **কোরিওনিক কোষ**। কোষগুলো **কোরিওনিক ভিলাই** সৃষ্টি করে। আম্বিলিকাল ধমনি ও শিরা নামক দুটি রক্ত বাহিকা এসব ভিলাইয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কৈশিক জালিকা নির্মাণ করে। প্রধান রক্তবাহিকাদুটি **আম্বিলিকাল কর্ড** (umbilical cord) নামক ৪০ সেমি. লম্বা একটি শক্ত গড়নের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে। অ্যামনিওন ও কোরিওন উদ্ভূত কোষে কর্ডটি বেষ্টিত থাকে।

প্লাসেন্টায় মাতৃদেহের অংশ হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়ামের প্রবর্ধনসমূহ। এসব প্রবর্ধন এবং কোরিওনিক ভিলাইয়ের মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে আর্টারিওল থেকে আগত ধমনি-রক্তে পূর্ণ স্থান। এসব স্থান দিয়ে জরায়ু-প্রাচীরে রক্ত আর্টারিওল থেকে ভেনিউলে প্রবাহিত হয়।

প্লাসেন্টা চাকতি আকৃতির, বেশ বড় গঠন। পূর্ণ গঠিত প্লাসেন্টার ওজন প্রায় ৬০০ গ্রাম, ব্যাস ১৫-২০ সেমি. এবং মাঝখানে ৩ সেমি. পুরু।

অমরার কাজ

১. সংস্থাপন : অমরার সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ু-প্রাচীরে সংস্থাপিত হয় ও সুরক্ষিত থাকে।

২. পুষ্টি : অমরা মায়ের রক্তস্রোত থেকে ভ্রূণের দেহে পুষ্টিদ্রব্য (মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, প্রোটিন ও ছোট ছোট লিপিড অণু) সরবরাহ করে।

৩. গ্যাসীয় বিনিময় : অমরা মাতৃদেহ ও ভ্রূণের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে শ্বসনে সাহায্য করে।

৪. রেচন : ভ্রূণের বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ অমরার মধ্য দিয়ে ব্যাপিত হয়ে মায়ের দেহে প্রবেশ করে।

৫. অনাক্রম্যতা : মাতৃদেহের রক্তে কয়েকটি রোগের বিরুদ্ধে যেমন ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতির জন্য উৎপন্ন অ্যান্টিবডি মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে ঐসব রোগের বিরুদ্ধে ভ্রূণকে অনাক্রম্য করে তোলে।

চিত্র ৯.১২ : অমরা

৬. জীবাণু বহন : কয়েক ধরনের ভাইরাসকে অমরা মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণে প্রবেশ করতে দিয়ে ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। [গর্ভকালীন সময়ে মা যদি সিফিলিস, হাম, জলবসন্ত, গুটিবসন্ত, রুবেলা এসব রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে ঐ ভাইরাস ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি বা অঙ্গহানি ঘটাতে পারে।]

৭. ওষুধ সেবন : চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ওষুধ মাতৃদেহ থেকে অমরার মাধ্যমে ব্যাপিত হয়ে ভ্রূণে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

৮. সঞ্চয় : অমরায় স্নেহ, গ্লাইকোজেন ও লোহা সঞ্চিত থাকে।

৯. হরমোন নিঃসরণ : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে অমরা চার ধরনের হরমোন ক্ষরণ করে। (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরণ, হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন ও কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন) জরায়ু-প্রাচীর ও স্তনগ্রন্থির গড়নে ও কাজে এবং প্রসব ঝামেলামুক্ত করণে সাহায্য করে।

ভ্রূণ আবরণী (Embryonic mumbrane)

প্রত্যেক প্রজাতিতে ভ্রূণের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা রয়েছে। মানবভ্রূণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি সবচেয়ে বেশী যত্নবান হয়ে ভ্রূণের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পুষ্টি সরবরাহ, গ্যাসীয় বিনিময়, রেচন পদার্থ ত্যাগ ইত্যাদি কোনো প্রক্রিয়াই যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তার জন্য ভ্রূণের চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলো ঝিল্লি। এসব ঝিল্লির উৎপত্তি সর্বপ্রথম সরিসৃপে ঘটলেও চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে।

পরিস্ফুটনকালে মানবভ্রূণ ৪টি ঝিল্লিতে বেষ্টিত থাকে। এগুলোকে **বহিঃভ্রূণীয় আবরণী** (extra embryonic membrane) নামে অভিহিত করা হয়। কারণ আবরণীগুলো ভ্রূণের আনুষঙ্গিক গঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ভ্রূণদেহের চতুর্দিক ঘিরে রাখে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বর্জিত হয়।

ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় আবরণীরূপে যেসব আনুষঙ্গিক গঠন সৃষ্টি হয়ে ভ্রূণদেহকে ঘিরে রেখে পরিস্ফুটন নির্বাহ করে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বর্জিত হয়, সেসব আবরণীকে **বহিঃভ্রূণীয় আবরণী** বলে। প্রাণিজগতের সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীতে যে ভ্রূণসংশ্লিষ্ট আবরণী রয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা বহিঃভ্রূণীয় আবরণী।

মানবভ্রূণে চারটি বহিঃভ্রূণীয় আবরণী রয়েছে, যথা–(১) অ্যামনিওন, (২) অ্যালানটয়েস, (৩) কোরিওন ও (৪) কুসুম থলি। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

১. অ্যামনিওন (Amnion) : ভ্রূণের এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মের অংশগ্রহণে গঠিত যে থলি আকৃতির আবরণ জলীয় পদার্থে পূর্ণ থেকে ভ্রূণকে ঘিরে রাখে, তাকে **অ্যামনিওন** বলে। এতে কোনো রক্তবাহিকা থাকে না।

কাজ : (i) ভ্রূণকে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে। (ii) ঝাঁকুনিজনিত আঘাত থেকে ভ্রূণকে রক্ষা করে। (iii) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করে। (iv) তরলে পূর্ণ হওয়ায় বাইরের চাপ ভ্রূণদেহে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

২. অ্যালানটয়েস (Allantois) : ভ্রূণীয় অন্ত্রের পশ্চাৎ প্রান্ত মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্মে গঠিত থলির মতো যে উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়ে কোরিওনের নিচে বিন্যস্ত হয়, তাকে **অ্যালানটয়েস** বলে। এতে রক্তবাহিকা ও জালিকা থাকে। অ্যালানটয়েস বাইরের দিকে বর্ধিত ও কোরিওনের সংগে যুক্ত হয়ে রক্তবাহিকা-সমৃদ্ধ অ্যালানটো-কোরিওন (allanto-chorion) সৃষ্টি করে।

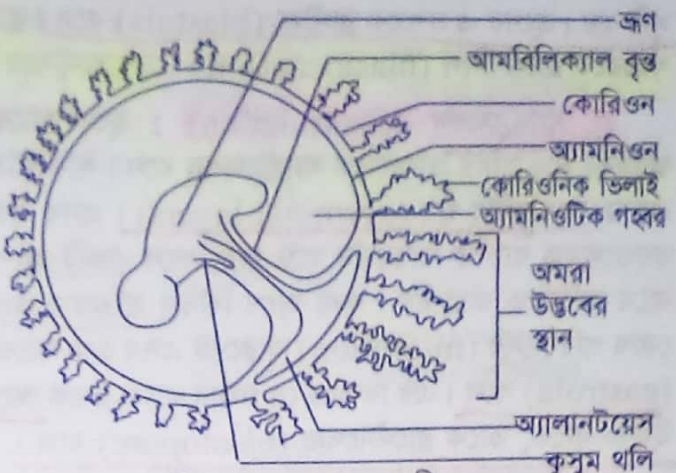

চিত্র ৯.১৩: ভ্রূণ আবরণী

কাজ : (i) ভ্রূণের শ্বসনে সাহায্য করে। (ii) ভ্রূণের রেচনে সাহায্য করে। (iii) অ্যালানটো-কোরিওন প্লাসেন্টা গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। → MAT

৩. কোরিওন (Chorion) : ভ্রূণের সর্ববহিঃস্থ আবরণ যা এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত হয়, তাকে **কোরিওন** বলে।

কাজ: (i) অ্যালানটয়েসের সঙ্গে মিলিতভাবে শ্বসনে ও পুষ্টি সরবরাহে সাহায্য করে।
(ii) প্লাসেন্টা গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

৪. কুসুম থলি (Yolk sac) : ভ্রূণের মধ্যান্ত্রের সংগে যুক্ত এবং এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত অপেক্ষাকৃত ছোট থলি আকৃতির তরলে পূর্ণ ঝিল্লিকে **কুসুম থলি** বলে। মানবভ্রূণের পুষ্টি কুসুম নির্ভর না হলেও সরিসৃপ, পাখি প্রভৃতির প্রচুর কুসুমযুক্ত ডিমে ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় যে ধরনের কুসুম থলি সৃষ্টি হয়, মানবভ্রূণেও তেমনটি হয়।

কাজ : কুসুম থলি **স্টেম কোষ** (stem cell)-এর উৎস হিসেবে কাজ করে। এসব কোষ থেকে রক্তকণিকা ও রক্ত কোষ উৎপন্ন হয়। স্টেম কোষগুলো পরবর্তীতে বর্ধনশীল ভ্রূণে প্রবেশ করে। তাই কুসুম থলি একটি গুরুত্বপূর্ণ

৬. মানব ভ্রূণের পরিস্ফুটন (Development of the Human Embryo) MAT

নিষেকের পর জাইগোট (2n) যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশু বা লার্ভায় পরিণত হয় তাকে **পরিস্ফুটন** বলে। প্রতিটি সদস্যের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াকে **ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন** (ontogenic development) বলা হয়। যে শাখায় জীবের ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হয়, তাকে **ভ্রূণবিদ্যা** (embryology) বলে। জাইগোট থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় **এমব্রায়োজেনেসিস** (embryogenesis)। ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনের ধাপগুলো নিম্নরূপ।

i. ক্লিভেজ (Cleavage) : যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য ভ্রূণকোষ সৃষ্টি করে তাকে **ক্লিভেজ বা সম্ভেদ** বলে। ক্লিভেজে সৃষ্ট ভ্রূণের প্রতিটি কোষকে বলে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere)। ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত কোষ বিভাজনের ফলে জাইগোটটি বহুকোষী নিরেট গোলকে পরিণত হয়। এর নাম **মরুলা** (morula)। মরুলার কোষগুলো ক্রমশ একস্তরে সজ্জিত হয় এবং এর ভিতরে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর

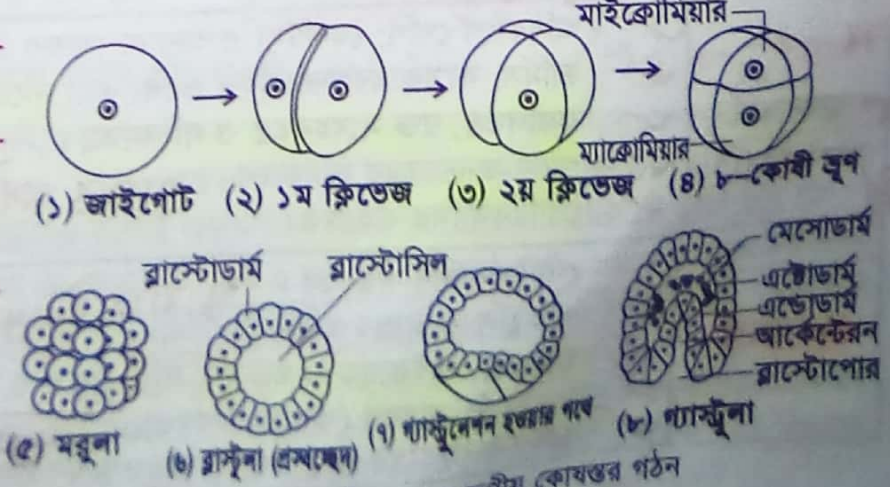

চিত্র ৯.১৪: ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় কোষস্তর গঠন

সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের এ দশাকে **ব্লাস্টুলা** (blastula) বলে। ব্লাস্টুলার প্রাচীরকে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm) এবং তরলপূর্ণ গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocael) বলে। ভ্রূণ ব্লাস্টুলায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ক্লিভেজ দশার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ii. গ্যাস্ট্রুলেশন (Gastrulation) : ভ্রূণে **আর্কেন্টেরন** (archenteron) নামক প্রাথমিক খাদ্যগহ্বর বা আন্ত্রিকগহ্বর সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **গ্যাস্ট্রুলেশন** বলে। পরিস্ফুটনের এ ধাপে ব্লাস্টোডার্ম দুই বা তিনটি কোষস্তর নির্মাণ করে। এদের বলে **ভ্রূণীয় স্তর** (germinal layers)। এসব স্তর থেকে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ গঠিত হয়। এ পর্যায়ে ভ্রূণীয় স্তরগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়, ফলে একটি অংশ ব্লাস্টোডার্মের পিঠেই রয়ে যায়। পরবর্তীতে একে **এক্টোডার্ম** নামে অভিহিত করা হয়। অন্য অংশ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে **মেসোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম**-এ পরিণত হয়। কোষ পরিবহনের (migration) কারণেই এসব হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়া শেষ হলে ভ্রূণ যে রূপ ধারণ করে তাকে **গ্যাস্ট্রুলা** (gastrula) বলে। এর ভিতরে যে গহ্বর থাকে তাকে **আর্কেন্টেরন** (archenteron), আর গহ্বরটি যে ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত থাকে, তাকে **ব্লাস্টোপোর** (blastopore) বলে।

iii. অর্গানোজেনেসিস (Organogenesis) : গ্যাস্ট্রুলেশনে সৃষ্ট ভ্রূণীয় স্তরগুলো থেকে ভ্রূণের **অঙ্গকুঁড়ি** (organ rudiment) সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অর্গানোজেনেসিস বলে। তিনটি ভ্রূণীয় স্তরেরই অভিন্ন কোষপিন্ড ছোটো ছোটো কোষগুচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রত্যেক গুচ্ছ প্রাণিদেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ বা অংশ নির্মাণ করে। এসব কোষগুচ্ছকে একেকটি অঙ্গের **কুঁড়ি** বলে। যে সব কুঁড়িতে ভ্রূণীয় স্তরগুলোর উপবিভক্তি ঘটে সেগুলোকে **প্রাইমারি অঙ্গকুঁড়ি** বলে। এদের কয়েকটি বেশ জটিল এবং এমন কতকগুলো কোষ নিয়ে গঠিত যারা একটি সম্পূর্ণ অঙ্গতন্ত্র গঠনেও সক্ষম। যেমন–সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র কিংবা পৌষ্টিকতন্ত্র ইত্যাদি। প্রাইমারি অঙ্গকুঁড়ি আরও বিভক্ত হয়ে **সেকেন্ডারি অঙ্গকুঁড়ি**-তে পরিণত হয়। পরবর্তীতে অঙ্গকুঁড়ি আরও বিকশিত হয়ে প্রাণীর নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে।

তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি (Fate of three Germ Layers)

গ্যাস্ট্রুলেশনের ফলে সৃষ্ট **এক্টোডার্ম**, **মেসোডার্ম** এবং **এন্ডোডার্ম** ভ্রূণের গঠন ও বিকাশের যাবতীয় উপাদানের উৎস। নিচে ছকের মাধ্যমে তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি উল্লেখ করা হলো।

তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি

ভ্রূণীয় স্তর	পূর্ণাঙ্গ প্রাণিদেহে যে অংশ গঠিত হয়
এক্টোডার্ম	১. ত্বকের এপিডার্মাল অংশ এবং ত্বকীয় গ্রন্থি, চুল, পালক, নখ, ক্ষুর, এক ধরনের শিং ও আঁইশ। ২. চোখ ও অন্তঃকর্ণ। ৩. পায়ুর আবরণ। ৪. দাঁতের এনামেলসহ মৌখিক গহ্বর। ৫. সুষুম্না স্নায়ুতন্ত্র ও কিছু পেশি।
মেসোডার্ম	১. অধিকাংশ পেশি; মেদটিস্যু ও অন্যান্য যোজক টিস্যু। ২. ডার্মিস, কয়েক ধরনের আঁইশ ও শিং এবং দাঁতের ডেন্টিন। ৩. **কঙ্কালতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র ও লসিকাতন্ত্র।** ৪. রেচন-জননতন্ত্রের অধিকাংশ। ৫. পৌষ্টিকনালির বহিঃস্তর।
এন্ডোডার্ম	১. পৌষ্টিকনালির অন্তঃস্তর। ২. পাকস্থলি ও অন্ত্রের গ্রন্থিসমূহ। ৩. **শ্বসনতন্ত্র**, থাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয়। ৪. মধ্যকর্ণের আবরণ (কখনও কখনও)। ৫. রেচন-জননতন্ত্রের কিছু অংশ (কখনও কখনও)।

পঞ্চম মাসে ভ্রূণ এ স্টেথোস্কোপ এর সাহায্যে হৃদস্পন্দন শোনা যায়।

৭. ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ (Development of Embryo and Featus)

মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণ সংস্থাপিত হওয়ার পর থেকে গর্ভকালীন ৮ম সপ্তাহের শিশুকে **ভ্রূণ** এবং এর পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে **ফিটাস** বলে। মাতৃগর্ভে শিশু প্রায় ৯ মাস (৩৬-৪০ সপ্তাহ) থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। এসময় যেসব পরিবর্তন ঘটে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

- ১ম সপ্তাহ : নিষেক, ক্লিভেজের ফলে নিষেকের ৪-৫ দিন পর ব্লাস্টোসিস্টের উৎপত্তি। কোষ সংখ্যা ১০০ এর অধিক। ৬-৯ দিন পর ইমপ্ল্যান্টেশন।
- ২য় সপ্তাহ : এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্ম গঠন। এ পর্যায়ের পর মানব ভ্রূণ নিয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ।
- ৩য় সপ্তাহ : গর্ভবতীর মাসিক বন্ধ। গর্ভাবস্থায় এটিই প্রথম লক্ষণ। মেরুদণ্ড, মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ডের উৎপত্তি শুরু। ভ্রূণ ২ মিলিমিটার।
- ৪র্থ সপ্তাহ : হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি, রক্ত এবং অন্ত্রের উৎপত্তি শুরু। **আমবিলিক্যাল কর্ড** বৃদ্ধিরত। ভ্রূণ ৫ মিলিমিটার।
- ৫ম সপ্তাহ : মস্তিষ্ক বৃদ্ধিরত। **লিম্ব বাড** (limb bud) এর উৎপত্তি যা থেকে হাত এবং পা তৈরি হবে।
- ৬ষ্ঠ সপ্তাহ : চোখ এবং কান গঠনের সূত্রপাত।
- ৭ম সপ্তাহ : মুখমণ্ডল তৈরি হয়। চোখে রং দেখা যায়।
- [illegible] সপ্তাহ : সকল অঙ্গ, পেশি, হাড়, হাত ও পায়ের আঙ্গুলসহ পরিণত ভ্রূণ। জনন অঙ্গ সুগঠিত।
- [illegible] সপ্তাহ : ভ্রু এবং অক্ষিপক্ষ (চোখের পাতার লোম) সহ লোমের উৎপত্তি শুরু। হাতের আঙ্গুলের রেখার বিকাশ।
- ২৪তম সপ্তাহ : চোখের পাতা খুলতে পারে।
- ২৬তম সপ্তাহ : অপ্রাপ্তকালে জন্ম হলে বেঁচে থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা।
- ২৮তম সপ্তাহ : বলিষ্ঠভাবে নড়াচড়ায় সক্ষম। স্পর্শ ও অতিশব্দ অনুভব করে এবং মূত্র ত্যাগ করে।
- ৩০তম সপ্তাহ : মাথা নিচ দিকে, জন্মের জন্য প্রস্তুত।
- ৩৮তম সপ্তাহ : সাধারণত ৯ মাসের শিশু জন্ম গ্রহণ করে।

চিত্র ৯.১৫ : জরায়ুর অভ্যন্তরে বৃদ্ধিরত শিশুর বিভিন্ন ধাপ

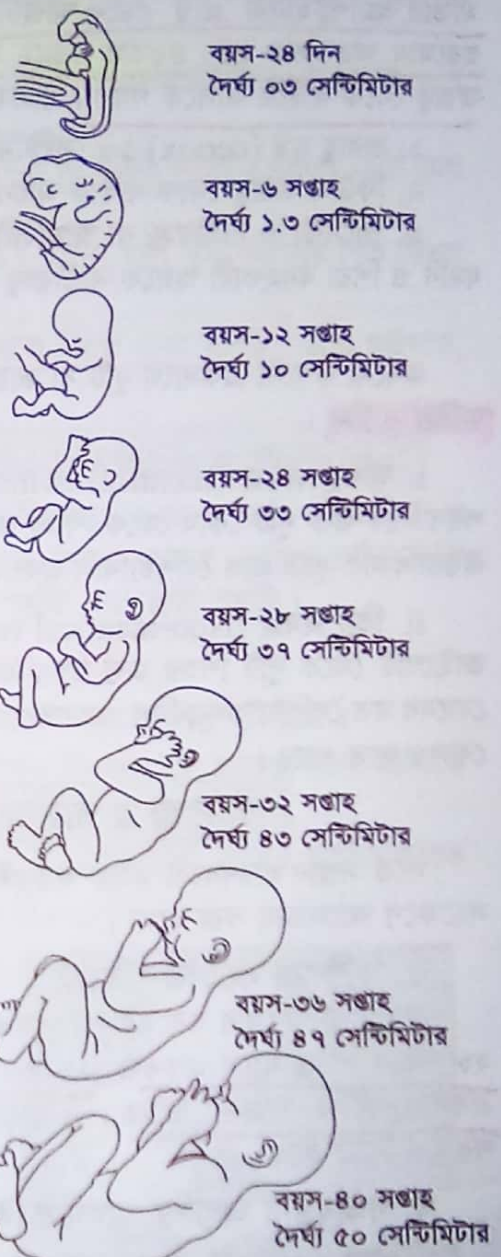

জন্মকালীন ওজন : ৩.১৭ – ৩.৬২ কেজি /৭–৮ পাউন্ড

শিশু প্রসব (Birth of a baby)

নিষেকের পর ৯-১০ সপ্তাহের মধ্যে বাহ্যিকভাবে ভ্রূণকে মানুষ হিসেবে শনাক্ত করা যায়। ভ্রূণের এ অবস্থাকে **ফিটাস** (foetus) বলে। জরায়ুতে ফিটাস প্রায় ৩৮ সপ্তাহ অবস্থান করে। এ সময়কালকে **গর্ভধারণকাল** (the gestation period) বলে। গর্ভধারণকালের প্রথম ১২ সপ্তাহের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে প্রধান অঙ্গসমূহের অধিকাংশ তৈরি হয়ে যায়।

শিশু প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণের জন্য ৩৮ সপ্তাহের সাথে ২ সপ্তাহ যোগ করে অর্থাৎ সর্বশেষ রজঃচক্রের প্রথম দিনের সাথে ৪০ সপ্তাহ যোগ করে সম্ভাব্য প্রসব দিন (Expected Delivery Date-EDD) নির্ধারণ করা হয়। তবে প্রসব ৫ দিন পূর্বে বা পরে হতে পারে। (৯ মাস ৭ দিন ± ৫ দিন)

মানুষে **গর্ভাবস্থা** (pregnancy) কাল গড়ে ৪০ সপ্তাহ। গর্ভাবস্থায় ১২তম সপ্তাহে প্লাসেন্টা নিঃসৃত **প্রোজেস্টেরণ** হরমোনের প্রভাবে জরায়ুর সংকোচন বন্ধ থাকে। গর্ভাবস্থায় রক্তে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা বাড়তে থাকে তবে ৩৮তম

ছয় মাস ভ্রূণ - ইনকিউবেটরে রেখে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস চালিয়ে বাঁচানো যায়।

সপ্তাহে রক্তে প্রোজেস্টরণের মাত্রা হঠাৎ করেই কমে যায় ফলে জরায়ু সংকোচনের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। একই সাথে মাতার অগ্রপিটুইটারী গ্রন্থি থেকে **অক্সিটসিন** (oxytocin) এবং প্লাসেন্টা থেকে **প্রোস্টাগ্লান্ডিন** (prostaglandin) হরমোন ক্ষরণ শুরু হয়। ৪০তম সপ্তাহে হরমোনদুটির সক্রিয়তায় জরায়ুর সংকোচন ঘটে। এ সংকোচনের ফলে শিশু জরায়ু থেকে বাইরে আসতে পারে। প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সংঘটিত হয়, যথা–

১. জরায়ু মুখ (cervix) ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

২. ফিটাস জরায়ু থেকে বাইরে আসে এবং

৩. প্লাসেন্টা ও নাভীরজ্জু বা **আমবিলিক্যাল কর্ড** (umbilical cord : ফিটাস থেকে প্লাসেন্টা পর্যন্ত আমবিলিক্যাল ধমনি ও শিরা বনহকারী অঙ্গকে নাভীরজ্জু বলে) জরায়ুর অভ্যন্তর থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

জমজ শিশু (Twin Babies)

কখনো কখনো একসাথে দুটি বা তার বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করে। এদের **জমজ শিশু** বলে। জমজ দুধরনের, যথা- **অভিন্ন** ও **ভিন্ন**।

i. **অভিন্ন জমজ** (Identical twins) : একটি জাইগোট ১ম বিভাজনের সময় দুটি পৃথক কোষে পরিণত হলে পরবর্তীতে উক্ত দুটি কোষ থেকে শিশুর জন্ম হয়। এরা একই লিঙ্গ বিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ে হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি এবং চেহারা প্রায় এক রকম হয়।

ii. **ভিন্ন জমজ** (Non-identical twins) : দুটি পৃথক ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে দুটি জাইগোট উৎপন্ন হলে- এই দুটি জাইগোট থেকে দুটি শিশুর জন্ম হয়। এদের বৈশিষ্ট্যাবলি হুবহু একই হয় না। বরং যে কোন দুই (ছোট-বড়) ভাই-বোনের মত বৈশিষ্ট্যাবলির মিল থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এরা দুই ভাই, দুই বোন অথবা একটি ভাই ও একটি বোনও হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও পরিচর্যা (Pregnancy & Care during Pregnancy)

গর্ভে সন্তান ধারণকারী মাকে **গর্ভবতী** (pregnant) বলা হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের পরিচর্যায় পালনীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচর্যা

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার শুরুতেই চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করানো ও তাঁর উপদেশ নেয়া উচিত। প্রথম পরীক্ষার পর ২৮ সপ্তাহ পর্যন্ত মাসে একবার, ২৯-৩৬ সপ্তাহ পর্যন্ত মাসে দুবার ও ৩৭ সপ্তাহ থেকে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে একবার পরীক্ষা করানো উচিত। এ ছাড়াও কখনো কোনো সমস্যা দেখা দিলে নির্ধারিত দিনের আগেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

খ. গর্ভাবস্থায় অন্যান্য পালনীয় বিষয়

১. খাদ্য : গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির উপরই নির্ভর করে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবনে ভালো থাকা। তাই সুষম সহজপাচ্য ও সঠিক পরিমাণ আহার প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় সুষম আহার বলতে বোঝায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বেশি পরিমাণ প্রোটিন, সঠিক পরিমাণ শর্করা ও কম পরিমাণ চর্বি জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ও অন্যান্য পদার্থ, যথা– জিঙ্ক, ফলিক এসিড, পটাসিয়াম, সেলেনিয়াম প্রভৃতি। সম্ভব হলে দিনে ১ লিটার দুধ, ১ বা ২ টুকরা মাছ বা মাংস, ১টি ডিম, ১টি বা ২টি ঋতুকালীন ফল, টাটকা শাকসব্জি এবং ভাত ও ডাল পেট ভরে খাওয়া উচিত। নিরামিষভোজীদের দুধের পরিমাণ বাড়াতে হয়। তা ছাড়া অঙ্কুরিত ছোলাও খাদ্য তালিকায় যোগ করা উচিত। প্রতিদিন ৬-৮ গ্লাস ফোটানো পানি খাওয়া প্রয়োজন।

২. কোষ্ঠকাঠিন্য : গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা থাকে। এর সমাধানকল্পে বেশি পরিমাণ শাকসব্জি খাওয়া দরকার। তা ছাড়া শুকনো খেজুর ও বীট খাবার তালিকায় রাখা উচিত।

৩. দাঁত : গর্ভাবস্থায় দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। তাই এ সময় দাঁত না তোলাই ভাল।

৪. বিশ্রাম : গর্ভাবস্থায় পরিমিত বিশ্রাম দরকার। দুপুরে দুঘন্টা, রাতে আটঘন্টা বিশ্রাম নেওয়া উচিত। সব সময় বাঁ পাশে কাত হয়ে শোয়া উচিত। এতে শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক হয়।

৫. কাজকর্ম : স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা নেই, তবে ভারী কাজকর্ম করা একেবারেই উচিত নয়।

৬. গোসল : রোজ গোসল করে শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গোসল করার সময় যেন পিছলে পড়ে না যায় সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

৭. কাপড় : গর্ভাবস্থায় **ঢিলেঢালা কাপড়** পড়া উচিত। বাংলাদেশের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুতীর কাপড়-চোপড় পড়া স্বাস্থ্যসম্মত।

৮. ভ্রমণ : ঝাঁকুনিযুক্ত ক্লান্তিকর ভ্রমণ গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস ও শেষ দুমাস না করাই ভালো। বাসের চেয়ে রেল ও বিমানে ভ্রমণ-ঝুঁকি অনেক কম।

৯. ধূমপান ও মদ্যপান : গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান অনুচিত। তা না হলে কম ওজনের শিশু কিংবা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।

১০. যৌনমিলন : গর্ভের প্রথম তিন মাস ও শেষ দেড় মাস যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা উচিত। এতে গর্ভপাত, অকাল প্রসব ও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ও পরিবার পরিকল্পনা (Birth Control Methods & Family Planning)

সন্তানের জন্ম বিভিন্ন উপায়ে রোধ করা সম্ভব। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা গর্ভনিরোধকের নানা পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান সময়ে যেসব গর্ভনিরোধক পদ্ধতি অনুসৃত হয় সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। গর্ভনিরোধক সকল ব্যবস্থাকে প্রধানত দুই শ্রেণিভুক্ত করা যায়, **অস্থায়ী পদ্ধতি** এবং **স্থায়ী পদ্ধতি**।

ক. অস্থায়ী পদ্ধতি (Temporary Methods)

১. শারীরিক পদ্ধতি : গর্ভনিরোধকের শারীরিক পদ্ধতি হচ্ছে নিরাপদ সময় নির্বাচন ও শিশ্ন বহিষ্করণ ঃ

- **নিরাপদ সময় নির্বাচন :** মাসিক রজঃচক্রের প্রথম ও শেষ সপ্তাহের দিনগুলোতে ফেলোপিয়ান নালিতে কোন পরিপক্ক ডিম্বাণু থাকে না বলে ঐ সময়কে যৌনমিলনের **নিরাপদ সময়** বলে।
- **শিশ্ন বহিষ্করণ :** সঙ্গমকালে শুক্রাণু স্খলনের মুহূর্তে যদি শিশ্নকে প্রত্যাহার করে দেহের বাইরে স্খলিত করা হয় তা হলে শুক্রাণু নিষেক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

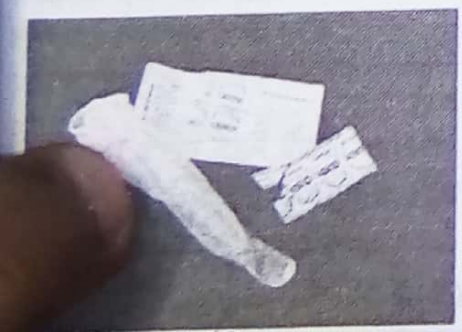

কনডম : সঙ্গমের পূর্বে শিশ্ন কনডমে আবৃত করে নিলে স্খলিত শুক্রাণু আর জরায়ুতে পড়ে না।

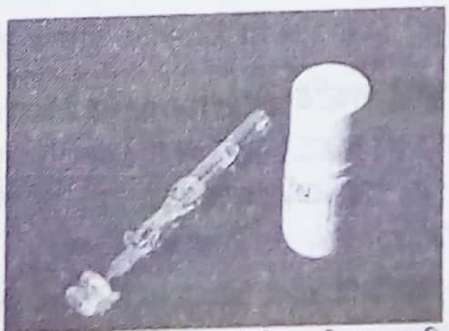

শুক্রনাশক : জেলি বা ফোম বড়ি হিসেবে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ যা যৌনমিলনের আগে স্থাপন করতে হয়।

ডায়াফ্রাম : মিলনের পূর্বে যোনিতে স্থাপন করতে হয়।

ক্যাপ : জরায়ুর অভ্যন্তরে স্থাপন করতে হয়।

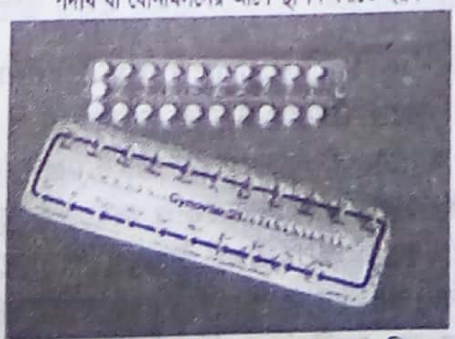

জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি : সেবনযোগ্য বড়ি; প্রতিদিন একটি করে সেবন করতে হয়।

পেস্যারি : মিলনের পূর্বে যোনিপথে একটি করে ব্যবহার করতে হয়; এটিও শুক্রনাশক রাসায়নিক পদার্থ

চিত্র ৯.১৬ : জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি

২. **রাসায়নিক পদ্ধতি :** শুক্রনাশক জেলি, ক্রীম, ফেনা বা ফোম বড়ি, জেল প্রভৃতি বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যৌনমিলনের আগে স্থাপন করতে হয়। এটি ২০-৩০ মিনিট পর্যন্ত কার্যক্ষম থেকে স্খলিত শুক্রাণুকে বিনষ্ট করে দেয়।

৩. **যান্ত্রিক পদ্ধতি :** জন্মনিরোধক হিসেবে বেশ কয়েক ধরনের যান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে ঃ

- **কনডম :** এটি পুরুষের ব্যবহারের জন্য এক ধরনের পাতলা, লম্বাটে রবারের থলি। সঙ্গমের পূর্বে শিশ্ন কনডমে আবৃত করে নিলে স্খলিত শুক্রাণু আর জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না।
- **ডায়াফ্রাম :** এটি মিলনের পূর্বে জেলি বা ফোম সহযোগে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের সহায়তায় যোনিতে স্থাপন করতে হয় এবং যৌন মিলনের পর অন্ততঃ ৬ ঘন্টা সেখানেই রাখতে হয়। ডায়াফ্রাম ব্যবহারে কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই, বরং জরায়ুর ক্যান্সার এবং কিছু যৌন রোগ প্রতিরোধ সহায়ক।
- **স্পঞ্জ :** এটি ভিজিয়ে যোনিতে স্থাপন করতে হয় এবং পর মুহূর্ত থেকেই কার্যক্ষম হলে ২৪ ঘন্টা অনবরত প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে।
- **অন্তর্জরায়ু গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা :** এ ব্যবস্থায় পলিথিন, তামা, রূপা বা স্টেনলেস স্টীল নির্মিত একটি ফাঁস (loop) জরায়ুর অভ্যন্তরে স্থাপন করলে তা জরায়ুর ভেতরে নিষিক্ত ডিম্বাণুর রোপনে বাধা দান করে।

৪. **শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি :** এ ব্যবস্থার প্রধান উপকরণ জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ও ইনজেকশন।

- **জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি :** এটি বিভিন্ন অনুপাতে এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণের মিশ্রণে তৈরি এবং মুখে গ্রহণযোগ্য বড়ি। রজঃচক্রের ৫-২৫তম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে বড়ি গ্রহণ করতে হয়। এগুলো মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের উপর কাজ করে ডিম্বপাতে বাধা দেয় এবং জরায়ুকণ্ঠের মিউকাস ঝিল্লিকে শুক্রাণু প্রবেশের বিরোধী করে তোলে। এটি একটি বহুল প্রচলিত জন্মনিরোধক পদ্ধতি কিন্তু অনেক মহিলার সাময়িক বমি বমি ভাব, ফোঁটা ফোঁটা স্রাব, উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধির মত উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
- **ইনজেকশন :** বেশ কয়েকমাস যাতে গর্ভধারণ ঝুঁকি নিরাপদে এড়ানো যায় তার জন্য ইদানিং এক ধরনের ইনজেকশন আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকায় এর গুণগত মান উন্নয়নের চেষ্টা চলছে।

৫. **গর্ভপাত :** অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ২-৩ মাস বয়সী ভ্রূণকে বিচ্যুত করিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ. স্থায়ী পদ্ধতি (Permanent Methods)

জন্মনিরোধের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করাকে **বন্ধ্যাকরণ** (sterilisation) বলে। এটি নিচে বর্ণিত দুধরনের।

১. **ভ্যাসেকটমি** (Vasectomy) : এ পদ্ধতিতে পুরুষের ক্ষেত্রে উভয় দিকের শুক্রনালির অংশকে কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাণু বাইরে আসতে না পারে।

২. **টিউবেকটমি** (Tubectomy) বা **লাইগেশন** (ligation) : এ পদ্ধতিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে উভয় দিকের ফেলোপিয়ান নালির অংশ কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাণু প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অধিক সন্তানবতী বা যাঁরা একেবারেই আর সন্তান চান না বা গর্ভধারণের জন্য শারীরিকভাবে অসুস্থ তাঁদের জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning)

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আজ নানা কারণে ভয়াবহ অনুভূত হচ্ছে। তাই সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিটি দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম জোরদার করে একে আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টা চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারলেই আমরা পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাও সহজেই বুঝতে পারব। জনবহুলতার ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো হচ্ছে : খাদ্যের অপ্রতুলতা; বস্ত্রের অপর্যাপ্ততা; উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব; সুচিকিৎসার অভাব; পরিবেশ দূষণের ফলে বিশুদ্ধ পেয় পানির এমনকি কোন কোন অঞ্চলে বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব; শিক্ষার অভাব; অপূরণীয় খনিজ সম্পদের বর্ধিত হারে উত্তোলন ও ব্যবহার; অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা; বেকারত্ব বৃদ্ধি; এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এক কথায় বলতে গেলে, মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে অনতে হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়

প্রত্যেকটি দেশই অনন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত। যে কোন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আগে এ দিকটি খতিয়ে দেখতে হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকেও প্রত্যেক দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা উচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে:

১. **বিয়ের বয়স :** নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বিয়ের বয়স নির্ধারিত থাকবে এবং আইন লংঘনকারীদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান থাকবে।

২. **সন্তান সংখ্যা :** দম্পতি পিছু "এক সন্তানই যথেষ্ট" এ শ্লোগান কার্যকর করতে হবে।

৩. **বিবাহ বন্ধনের নিয়মকানুন :** বিভিন্ন ধর্মমতের বিবাহ পদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে হবে। কোথাও বহুবিবাহ সিদ্ধ থাকলে সেক্ষেত্রে সন্তানসংখ্যা সম্পর্কে কঠোর আইন এবং আইন লংঘনকারীর উপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে।

৪. **শিক্ষা :** প্রাথমিক পর্যায় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেক দম্পতিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য দক্ষ মাঠকর্মী নিয়োগ ও অদক্ষদের ছাঁটাই করতে হবে।

৫. **গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা :** কাঙ্খিত সন্তানসংখ্যা ও তা নির্দিষ্ট বয়স অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সক্ষম দম্পতিদের স্থায়ী গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করাতে হবে। এ বিষয়ে গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও শহরের ওয়ার্ড কমিশনারদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. **সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :** নির্ধারিত সময়ের পর বিয়ে এবং এক সন্তান / দুই সন্তানবিশিষ্ট পরিবারকে লেখাপড়া, ভ্রমণ ও চাকুরীতে বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

আইভিএফ পদ্ধতি (IVF–In Vitro Fertilization Process)–কৃত্রিম গর্ভধারণ -MAT 17

সাধারণত নারীদেহের অভ্যন্তরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের একীভবনের মধ্য দিয়ে **নিষেক** সম্পন্ন হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুটি গর্ভাশয়ের প্রাচীরে সংস্থাপিত হয়ে প্রায় ৯ মাস পর পরিস্ফুটন শেষে একটি শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এ প্রক্রিয়াটি **স্বাভাবিক গর্ভধারণ** (natural conception) নামে পরিচিত। ডিম্বনালি বন্ধ হয়ে গেলে, ক্ষত হলে বা এন্ডোমেট্রিওসিস পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর সংখ্যা কম হলে বা অস্বাভাবিক গড়নের শুক্রাণু হলে, অথবা নারী ও পুরুষ উভয় থেকে বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হলে, নারীতে ডিম্বপাত না হলে IVF গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। তখন দেহের বাইরে গবেষণাগারে কাঁচের পাত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে স্থাপন করে গর্ভধারণ নিশ্চিত করানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রক্রিয়ার নাম **ইন ভিট্রো নিষেক** (In Vitro Fertilization, সংক্ষেপে IVF) প্রক্রিয়া। 'in vitro' একটি ল্যাটিন শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে **কাঁচের ভিতরে** ('within the glass')। প্রক্রিয়াটি **টেস্ট টিউব পদ্ধতি** এবং ভূমিষ্ঠ শিশুটি **টেস্ট টিউব বেবী** নামে সাধারণভাবে প্রচলিত। ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই লন্ডনের ওল্ডহ্যাম জেনারেল হসপিটালে Patric Steptoe এবং Robert Edwards এর তত্ত্বাবধানের জন্ম নেয় বিশ্বের সর্বপ্রথম টেস্ট টিউব বেবী **লুইস ব্রাউন** (Louise Browin) নামের কন্যা শিশুটি। বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় এই অনন্য অবদানের জন্য এদেরকে ২০১০ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে প্রথম টেস্ট টিউব বেবীর জন্ম হয় ২০০১ সালে।

জনক –Dr. Robert Edward. এজন্য ২০১০ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

আইভিএফ পদ্ধতির ধাপসমূহ

আইভিএফ পদ্ধতি ছাড়া আর কোনও উপায়ে গর্ভধারণ সম্ভব নয় নিশ্চিত হলে যে কোনো দম্পতি প্রশিক্ষিত ও আধুনিক হাসপাতাল বা ক্লিনিকে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে পারেন। সব চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রায় একই ধরনের চিকিৎসা সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিচে এ ধাপগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে সাধারণ ধারণা দেয়া হলো।

ধাপ–১. স্বাভাবিক রজঃচক্র দমন : IVF-এর প্রথম ধাপে স্ত্রীর স্বাভাবিক রজঃচক্র দমিয়ে রাখতে একটি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ওষুধটি ইনজেকশন হিসেবে কিংবা নাকের ভেতর স্প্রে করে দেয়া হয়।

ধাপ–২. ডিম্বাণুর সরবরাহ বৃদ্ধি : নারীদেহে সাধারণত প্রতিমাসে একটি করে ডিম্বাণু পরিণত (mature) হয়। কিন্তু কৃত্রিম গর্ভধারণের ক্ষেত্রে একাধিক ডিম্বাণুর প্রয়োজন হয় কারণ একটিমাত্র ডিম্বাণু নিয়ে পূর্ণ-চিকিৎসা সম্পন্ন করার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। এ কারণে ডিম্বাণুর উৎপাদন বাড়াতে FSH (Follicle Stimulating Hormone) নামে হরমোনযুক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশি ডিম্বাণু উৎপাদিত হলে বেশি ডিম্বাণু নিষিক্ত করে যাচাই-বাছাইয়ে সুবিধা হবে। এভাবে ডিম্বাশয়কে বেশি ডিম্বাণু উৎপাদনে উদ্দীপ্ত করা হয়।

ধাপ–৩. অগ্রগতি পরীক্ষা : ডিম্বাণু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় ধাপে প্রয়োগিত হরমোনের ফলাফল পরীক্ষা করা হয় তৃতীয় ধাপে। এ জন্য আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান (বা ছবি) ও হরমোনের মাত্রা যাচাইয়ের জন্য রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা হয়।

ধাপ–৪. ডিম্বাণু সংগ্রহ : ডিম্বাণু সংগ্রহের ৩৪-৩৮ ঘন্টা আগে ডিম্বাণু পরিপক্কতায় সাহায্য করতে আরেকবার হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হয়। **ডিম্বাণু চোষক** (follicular aspiration) প্রক্রিয়ায় নারীদেহের ডিম্বাশয় থেকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়। এর আগে অবশ্য ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ানো হয়। আল্ট্রাসাউন্ড ছবির সূত্র ধরে যোনি পথে একটি সূক্ষ্ম ফাঁপা সূচ প্রবেশ করিয়ে ডিম্বাশয় ও ফলিকলে (ডিম্বথলিতে) আবৃত ডিম্বাণুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সূঁচটি চোষক যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো থাকে। এ যন্ত্র ডিম্বাশয়ের ফলিকল থেকে সামান্য তরলসহ ডিম্বাণু সংগ্রহ করে। এভাবে একটি একটি করে সুস্থ ও পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগৃহীত হয়। একটি ডিম্বাণু সংগ্রহের পর সেটি নির্ধারিত পাত্রে রেখে আবার আরেকটি ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক ডিম্বাশয় থেকে পর্যাপ্ত পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগ্রহের পর নিষেকের পূর্ব পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় (নারীদেহের সমান তাপমাত্রায়) সংরক্ষিত থাকে।

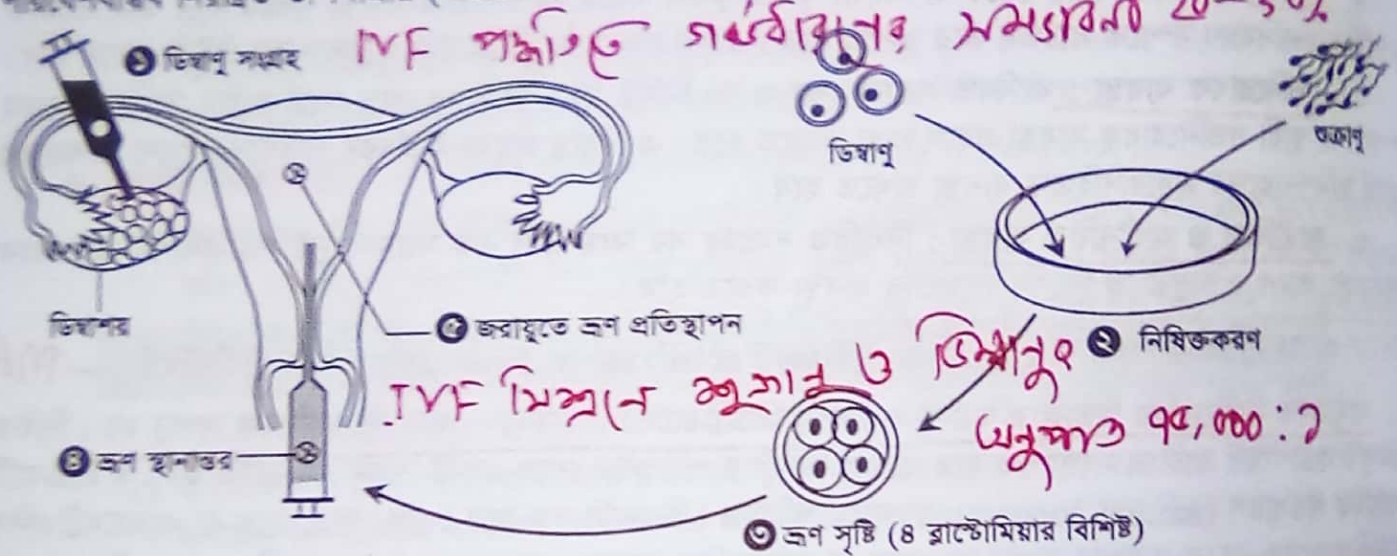

চিত্র ৯.১৭ : আই.ভি.এফ এর বিভিন্ন ধাপ

ধাপ–৫. শুক্রাণু সংগ্রহ : নারীর ডিম্বাণু সংগ্রহের সময়কালে পুরুষ সঙ্গীকে শুক্রাণু দানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। শুক্রাণু সংগ্রহের পর কিছু সময়ের জন্য কালচার মিডিয়ামে জমা রাখা হয়। এর পর তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় বীর্যরস পরিষ্কার করে দ্রুতগতিতে ঘূর্ণনের মাধ্যমে সুস্থ ও সক্রিয় শুক্রাণু নির্বাচন করা হয়।

ধাপ–৬. ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ : গবেষণাগারে ইনক্যুবেটরে রাখা সর্বোচ্চ গুণগত মানের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে নিষেকের জন্য একসঙ্গে ১৬-২০ ঘন্টা পেট্রিডিশ বা কাঁচের টিউবে রেখে দেয়া হয়। প্রত্যেক ডিম্বাণুর জন্য প্রায় একলক্ষ শুক্রাণুর ব্যবস্থা রাখা হয়। এরপর পরীক্ষা করে দেখা হয় কোনো ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়েছে কিনা। নির্ধারিত সময় পর যদি নিষেক না ঘটে থাকে তখন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে একটি ডিম্বাণুর ভিতরে একটি শুক্রাণুর প্রবেশ ঘটিয়ে নিষেকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ার নাম **অন্তঃসাইটোপ্লাজমিক শুক্রাণু ইনজেকশন** (intracytoplasmic sperm injection, সংক্ষেপে ICSI)। নিষেক ঘটেছে এবং ক্লিভেজ (বিভাজন) শুরু হয়েছে এমন অবস্থা দেখা দিলেই নিষিক্ত ডিম্বাণুকে ভ্রূণ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ধাপ–৭. ভ্রূণ স্থানান্তর : নিষিক্ত ডিম্বাণু সংগ্রহের পর ১-৬ দিনের মধ্যে (সাধারণত ২-৩ দিনের মধ্যে) নারীর জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয়। এ সময়ের ভিতর নিষিক্ত ডিম্বাণু ২-৪ ব্লাস্টোমিয়ার বিশিষ্ট ভ্রূণে রূপ নেয়। একটি সুস্থ, সক্রিয় বিভাজনশীল ভ্রূণকে ক্যাথেটারের সাহায্যে আল্ট্রাসাউন্ড প্রতিচ্ছবি দেখে গর্ভাশয়ে সাবধানে স্থাপন করা হয়। এটি একটি ব্যথাহীন প্রক্রিয়া, তবে কেউ পেশিতে সামান্য খিল ধরায় আক্রান্ত হতে পারে। ভ্রূণ যদি জরায়ু অর্থাৎ গর্ভাশয়ে সংস্থাপিত হয় তাহলে গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে মনে করা হয়। এরপর ১০ মিনিট থেকে ৪ ঘন্টার মধ্যে গর্ভবতী বাসায় চলে যেতে পারেন। কেউ একাধিক ভ্রূণ গর্ভাশয়ে সংস্থাপন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত অবস্থা, বয়স প্রভৃতি বিশেষ বিবেচনায় নিতে হয়। অনেকে একটি ভ্রূণ সংস্থাপিত হওয়ার পর বাকি ভ্রূণগুলোকে গবেষণাগারে ভবিষ্যতে সংস্থাপনের জন্য, কেউবা অন্য কাউকে দান করার জন্য গবেষণাগারের বিশেষ প্রক্রিয়ায় জমা রাখেন।

সংস্থাপনের পরবর্তী সময়কালটি সুনির্দিষ্ট নজরদারির মধ্যে থাকতে হয়। কারণ IVF পদ্ধতিতে জীবিত সন্তান জন্মদানের হার খুব বেশি নয়।

প্রথম টেস্টটিউব কুকুরের জন্ম : যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক গত ০৯/১২/২০১৫ তারিখে আইভিএফ পদ্ধতিতে সাতটি কুকুরছানার জন্ম দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে এসব গবেষকেরা একটি কুকুরীর জরায়ুতে ১৯টি ভ্রূণ স্থাপন করে এ সাফল্য পান। বিজ্ঞানীদের এই সাফল্যের প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে। কারণ এই আইভিএফ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন প্রাণী সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত : বাংলাদেশে প্রথম ত্রয়ী টেস্টটিউব বেবি হিসেবে জন্মগ্রহণ করে হীরা, মনি ও মুক্তা। এদের জন্ম হয় ২০০১ সালের ৩০ মে। এদের পিতা ও মাতা যথাক্রমে আবু হানিফ এবং ফিরোজা বেগম। এ দম্পতি Bangladesh Assited Conception Center (BACC) and Women's Hospital (WH), ঢাকা এর Dr. Fatema Parveen এর তত্ত্বাবধায়নে ১৯৯৪ সাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ৬ বছর পর সন্তানত্রয় জন্মদানে সক্ষম হন। বর্তমানে বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি নিয়ে সাফল্যজনকভাবে কাজ চলছে। বেসরকারীভাবে বেশ কয়েকটি আই.ভি.এফ সেন্টার রয়েছে।

আইভিএফ-এর সুবিধা-অসুবিধা

আইভিএফ-এর সুবিধা : এতে মাতৃত্বের বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহজ পদ্ধতি। ডিম্বনালি ক্ষতিগ্রস্ত থাকলেও গর্ভধারণ সম্ভব। এর দীর্ঘস্থায়ী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

আইভিএফ-এর অসুবিধা : বেশিবার গর্ভধারণে গর্ভপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এতে শিশুর অকাল জন্ম হতে পারে। এটি ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসা। ওষুধের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মানসিক চাপে স্নায়ুবিক দৌর্বল্য দেখা দিতে পারে।

প্রজননতন্ত্রের সমস্যা (Problems of Reproductive System)

পুরুষ ও নারীর প্রজনন অক্ষমতা (Male and Female Infertility)

...নো গর্ভনিরোধক পদার্থ বা পদ্ধতি ব্যবহার না করে এক বছর নিয়মিত দাম্পত্য জীবন কাটানোর পরও যদি কোনো ...র্ভধারণে ব্যর্থ হয় তখন তা **প্রজনন অক্ষমতা** বলে বিবেচিত হবে। দম্পতির পুরুষ সঙ্গী, নারী সঙ্গী কিংবা উভয়েই ...ক সমস্যায় ভুগতে পারে। অর্থাৎ তারা অনুর্বর (infertile)। অনুর্বর বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট নারী-পুরুষ দম্পতির ...ান উৎপাদন ক্ষমতা কম। তার মানে এ নয় যে তারা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম বা বন্ধ্যা (sterile)। বন্ধ্য বা বন্ধ্যা যাই বলি না কেন তারা কোনদিন সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হবে না, কিন্তু অনুর্বর ব্যক্তি-দম্পতি চিকিৎসার কল্যাণে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানে সক্ষম। পৃথিবীর ১৫% দম্পতি অনুর্বর (infertile) কিন্তু মাত্র ১-২% দম্পতি **বন্ধ্যা বা বন্ধ্য** (sterile)।

পুরুষে প্রজননিক সমস্যার কারণ (Cause of Male Infertility)

দম্পতির পুরুষ সদস্যে প্রজননিক সমস্যার মূলে রয়েছে নিচে বর্ণিত শুক্রাণুগত বিশৃঙ্খলা।

১. **বীর্যে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি** (Absence of sperm) : বীর্যে শুক্রাণুর অনুপস্থিতিকে **অ্যাজোস্পার্মিয়া** (azoospermia) বলে। শুক্রাণু উৎপাদন না হওয়া বা কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে বীর্যে শুক্রাণু অনুপস্থিত থাকতে পারে।

২. **বীর্যে শুক্রাণু সংখ্যার স্বল্পতা** (Low sperm count) : বীর্যে শুক্রাণু সংখ্যার স্বল্পতাকে **অলিগোস্পার্মিয়া** (oligospermia) বলে। এক্ষেত্রে প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটার বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা ২০ মিলিয়নের কম থাকে। অলিগোস্পার্মিয়ার নির্দিষ্ট কোন কারণ জানা নেই।

৩. **শুক্রাণুর অস্বাভাবিকতা** (Abnormal sperm) : অনেক শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছতে বা নিষেক ঘটাতে অক্ষম। দুটি লেজ থাকা, লেজবিহীন, মস্তকবিহীন বা অস্বাভাবিক আকৃতি ইত্যাদি হলো শুক্রাণুর অস্বাভাবিকতা।

৪. **অটোইম্যুনিটি** (Autoimmunity) : নিজের শুক্রাণুর প্রতি বিশেষ ইম্যুন প্রতিক্রিয়া ৫-১০% পুরুষ বন্ধ্যাত্বের কারণ। রক্তে শুক্রাণু প্রতিরোধী আয়ন থাকা এক ধরনের ইম্যুন প্রতিক্রিয়া।

৫. **শুক্রাণুর অকালপতন** (Premature ejaculation) : নারী যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরে পুরুষ যৌনাঙ্গ প্রবেশের আগেই শুক্রাণুর পতন ঘটে। অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ অবস্থা কাটিয়ে উঠা সম্ভব।

৬. **পুরুষত্বহীনতা** (Impotence) : যৌনাঙ্গের দৃঢ়তা রক্ষায় ব্যর্থতাও অন্যতম প্রজননিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। তবে উপযুক্ত মনোবৈজ্ঞানিক উপদেশ এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হতে পারে।

নারীতে প্রজননিক সমস্যার কারণ (Cause of Female Infertility)

নারীদেহে যে সব কারণে প্রজননিক সমস্যা দেখা যায় তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. **ডিম্বপাতে ব্যর্থতা** (Failure to ovulation) : প্রায় ১০% নারী ডিম্বপাতে ব্যর্থ বলে প্রজননিক বিষয়েও বিফল হয়। ডিম্বপাতে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে হরমোনঘটিত। কখনও হাইপোথ্যালামাস বা পিটুইটারি গ্রন্থি স্বাভাবিকভাবে হরমোন ক্ষরণে ব্যর্থ হয় ফলে ডিম্বাণুর ফলিকল (ডিম্ব থলি) পরিস্ফুটিত হয় না, ডিম্বপাতও ঘটে না। অন্যদিকে, ডিম্বাশয় থেকে স্বাভাবিক হরমোনগুলো ক্ষরিত না হওয়ায় কিংবা ডিম্বাশয় ক্ষতিগ্রস্ত হলে নির্ধারিত হরমোন ক্ষরিত হয় না বলে ডিম্বপাত ঘটে না। তবে খুশির কথা এই যে ৯০% ক্ষেত্রে হরমোন ক্ষরণে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সংশ্লেষিত হরমোন ভাল কাজ দেয়।

২. **ডিম্বনালির ক্ষত** (Damage to the oviducts) : প্রায় ৩৫% নারীর প্রজননিক সমস্যা হিসেবে ডিম্বনালির সংক্রমণজনিত বা **এন্ডোমেট্রিওসিস** (endometriosis) নামক অবস্থার কারণকে দায়ী করা হয়। এসব সমস্যার কারণে ডিম্বনালি পথে ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে জরায়ুতে বহন করতে পারে না।

৩. **জরায়ুর ক্ষত** (Uterus damage): প্রায় ৫-১০% নারী জরায়ু-ক্ষতজনিত সমস্যার কারণে প্রজননিক জটিলতায় ভোগে। এমন ক্ষেত্রে গর্ভধারণ সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে গর্ভাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা গর্ভপাত ঠেকানো। জরায়ুতে ছোট-বড় টিউমার হলে শল্য চিকিৎসায় সাড়ানো যায়। গর্ভনিরোধক দ্রব্যাদি ব্যবহারে ভাল কাজ করে। কখনওবা জন্মগতভাবে বিকৃত গড়নের জরায়ু দেখা যায়।

৪. **সার্ভিক্স বা জরায়ু গ্রীবার ক্ষত** (Cervix damage) : গর্ভপাতের কারণে কিংবা সন্তান জন্মদানকালে সার্ভিক্সে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষতের টিস্যু সার্ভিক্সকে সংকীর্ণ করে দেয়, মিউকাস ক্ষরণ বন্ধ করে দিতে পারে। সার্ভিক্সের মিউকাসের মাধ্যমে জরায়ুতে শুক্রাণু সহজে পৌছাতে পারে। সার্ভিক্স বেশি প্রশস্ত হলে তিন মাস বয়সি ভ্রূণ গর্ভপাতের শিকার হতে পারে।

৫. **শুক্রাণুর প্রতি অ্যান্টিবডি** (Antibodies to sperm) : কিছু দুর্লভ ক্ষেত্রে নারী তার স্বামীর শুক্রাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। জরায়ু, সার্ভিক্স (জরায়ু-গ্রীবা) ও ডিম্বনালিতে এগুলো পাওয়া যায়। ওষুধ প্রয়োগে অনাক্রম্যতন্ত্র দমিয়ে রেখে সমস্যার সমাধান করতে পারলেও আইভিএফ (IVF) সবচেয়ে ভালো পন্থা বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পুরুষ ও নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা
(Imbalance of Reproductive Hormones of Male and Female)

প্রজননতন্ত্র মানুষের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গতন্ত্র। এর সুষ্ঠু কর্মকান্ডও সম্পন্ন হয় কয়েকটি প্রধান ও অপ্রধান প্রজননিক হরমোনের সক্রিয়তায়। এসব হরমোনের কার্যকারিতায় পরিচিত নারী ও পুরুষ একেক সময় একেক রূপে অবির্ভূত হয় বলে মনে হয়।

নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

ডিম্বাশয় থেকে অনেক হরমোন ক্ষরিত হয়। তার মধ্যে **এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরণ** ও **অ্যান্ড্রোজেন** প্রধান। এসব হরমোনের ক্ষরণের মাত্রা কম-বেশি হলে স্বভাবতই ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

এস্ট্রোজেন সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা

উচ্চমাত্রার এস্ট্রোজেন : ৩৫ বছরের বেশি বয়স্ক নারীর দেহে উচ্চ মাত্রার এস্ট্রোজেন থাকে। এ সংক্রান্ত জটিলতাকে বয়স ও রজঃচক্রজনিত স্বাভাবিক সমস্যা হিসেবে মেনে নিয়ে নারীরা দিন কাটায়। উচ্চমাত্রার এস্ট্রোজেনের ফলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তার মধ্যে রয়েছে **প্রাক-রজঃচক্রীয় সিন্ড্রোম** (pre-menstrual syndrome, PMS)। এর ফলে স্তন ফুলে যায়, স্পর্শকাতর ও ব্যথাকাতর হয়; শরীরে পানি জমে, ওজন বেড়ে যায়; ব্রণ উঠে, স্তনবৃন্ত থেকে স্রাব নির্গত হয়; ভালো ঘুম হয় না, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়; দুর্বল লাগে; মাথা ব্যথা, মাইগ্রেন, স্তনব্যথা, পিঠের নিচে ব্যথা হয়; মিষ্টি ও নোনতা খাবারের জন্য ব্যকুল হয়ে পড়ে; আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে; কোনো কাজে মন বসে না; স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে পারে; সহবাসে অনাগ্রহ জন্মে, কিংবা গর্ভপাতও হতে পারে।

নিম্নমাত্রার এস্ট্রোজেন : রজঃনিবৃত্তকালে নিম্নমাত্রার এস্ট্রোজেন থাকা স্বাভাবিক। তবে কারও জরায়ু অপসারিত হলে, কেমোথেরাপি বা বিকিরণ থেরাপির সম্মুখীন হলে তাদের শরীরেও এস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যায়। এস্ট্রোজেন মাত্রা কম হলে যোনিদেশের চারপাশের প্রাচীর পাতলা হয়ে শুকিয়ে যায় যে কারণে সহবাস কষ্টদায়ক হয়। এর ফলে ইউরেথ্রার

প্রাচীরও পাতলা হয়ে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া, অবসাদ, রাতে ঘাম হওয়া, মনোযোগে বিঘ্ন ঘটা, সন্ধিব্যথা, ত্বক শুষ্ক হওয়া, মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, আতংকগ্রস্ত থাকা ইত্যাদিও কম এস্ট্রোজেনের কুফল।

প্রোজেস্টেরণ সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা

উচ্চমাত্রার প্রোজেস্টেরণ : প্রোজেস্টেরণ সাধারণত রজঃচক্রকালে ক্ষরিত হয়। যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করে তাদের দেহে এ হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। অবসাদ ও যন্ত্রণাহরণকারী ওষুধ সেবনেও প্রোজেস্টেরণের মাত্রা বেড়ে যায়, রজঃস্রাবের পরিমাণ কমে যায় এবং ইউরেথ্রার প্রাচীরে প্রভাব বিস্তার করে। দেহে উচ্চমাত্রার প্রোজেস্টেরণের লক্ষণ হচ্ছে– বুকে ব্যথাপ্রবণতা ও স্ফীত হওয়া, অস্থির মেজাজ, অতিরিক্ত ঘুমভাব, কার্যকর এস্ট্রোজেন স্বল্পতা ইত্যাদি।

নিম্নমাত্রার প্রোজেস্ট্রেরণ : নারীদেহে প্রোজেস্টেরণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের একটি। দেহের অনেক সূক্ষ্ম কাজের উদ্দীপক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এটি অন্যতম মৌলিক হরমোন যা প্রয়োজনে এস্ট্রোজেন ও কর্টিসোন উৎপন্ন করে। দেহে নিম্নমাত্রার প্রোজেস্ট্রেরণের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে– অনুর্বরতা, পিত্তথলির অসুখ, অনিয়মিত রজঃচক্র, রজঃচক্রের সময় রক্তজমাট, স্তনব্যথা, শুষ্ক যোনিদেশ, কম ব্লাড-শ্যুগার, অবসাদ, ম্যাগনেসিয়াম স্বল্পতা প্রভৃতি।

অ্যান্ড্রোজেন সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা

উচ্চমাত্রার অ্যান্ড্রোজেন : নারীদেহে অ্যান্ড্রোজেনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে প্রয়োজনে এস্ট্রোজেন নামক স্ত্রীহরমোনে পরিবর্তিত হওয়া। এসব হরমোন রজঃনিবৃত্তির আগে, সময়কালীন ও পরবর্তী সময় জননতন্ত্র, অস্থি, বৃক্ক, যকৃত ও পেশিসহ দেহের অন্যান্য অঙ্গ ও সেগুলোর কাজকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। যৌন উত্তেজনা ও মিলনেও [illegible] প্রভাব বিস্তার করে। দেহে উচ্চমাত্রার অ্যান্ড্রোজেন উপস্থিতির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে– অনুর্বরতা, রজঃচক্র [illegible]ওয়া বা একেবারে না হওয়া, পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম (Polycystic Ovary Syndrome, PCOS), [illegible]স্থান লোমশ হওয়া (যেমন–মুখমন্ডল, ঠোঁট প্রভৃতি জায়গায়), চুল কমে যাওয়া, ব্রণ দেখা দেয়া, ভাল [illegible]ল কমে যাওয়া, খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া, উদরের চতুর্দিক ঘিরে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি।

নিম্নমাত্রার অ্যান্ড্রোজেন : নিম্নমাত্রার অ্যান্ড্রোজেনে সব বয়সের নারীরা বিভিন্ন জটিলতায় ভুগতে পারে। তবে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছে প্রাকরজঃনিবৃত্ত ও রজঃনিবৃত্তকালীন নারী। এ সময় পিটুইটারী গ্রন্থিতে টিউমার দেখা দিতে পারে এবং হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। অবসাদ, উত্তেজনা হ্রাস, ভাল মন্দের বাছবিচার থাকে না, যোনিদেশে শুষ্কতা প্রভৃতি নিম্নমাত্রার অ্যান্ড্রোজেনসংক্রান্ত জটিলতার লক্ষণ।

পুরুষে প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

টেস্টোস্টেরণ পুরুষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। জননক্ষম পুরুষে এটি নিয়মিত শুক্রাশয়ে উৎপন্ন ও রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয়ে দেহ সুস্থ রাখে। এ হরমোন পুরুষে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের (পেশল দেহ, দাড়ি-গোঁফের প্রকাশ, কণ্ঠ পুরু ও স্বর গভীর করে তোলে, যৌনাঙ্গ সুগঠিত ও বড় করে) প্রকাশ ঘটায়। এ হরমোন যৌন উদ্দীপনাকে তাড়িত করে এবং FSH (Follicle Stimulating Hormone)-এর সহযোগিতায় শুক্রাণু সৃষ্টিতে উদ্দীপনা যোগায়। বয়স্ক পুরুষে যাদের যৌনশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, কিছু গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিলোপ ঘটে তারা হরমোন প্রতিস্থাপনার মাধ্যমে পুনর্যৌবন ফিরে পেতে চায় কিন্তু এতে হিতে বিপরীত ফল হয়, প্রস্টেট গ্রন্থির **ক্যান্সার** ও **অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস**-এর সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়।

সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুরুষে টেস্টোস্টেরণের ভারসাম্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠে। গড়ে ৪০–৫০ বছরের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা নিচে বর্ণিত লক্ষণগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হতে থাকে।

১. **অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল অনুভব :** এ লক্ষণ নানাভাবে প্রকাশ হতে পারে, যেমন– খাওয়ার পর ক্লান্তিবোধ, স্বাভাবিকের চেয়ে কম কাজ করতে পারা, সারাদিনের সামগ্রিক কাজের পারফরমেন্স নিচুমাত্রার এবং সারাদিন অবসাদগ্রস্ত থাকা। তা ছাড়া, মিলন আকাঙ্খা কমে যাওয়া, ঘাম হওয়া, গায়ে ব্যথা হওয়া, যৌনাঙ্গ কর্মক্ষম না হওয়া প্রভৃতিও টেস্টোস্টেরণ হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফল।

২. **অকালে বুড়িয়ে যাওয়া :** দৈহিক ও মানসিকভাবে বুড়িয়ে যাওয়া এ হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফল। চুল পাতলা বা ধূসর হয়ে যাওয়া, হাড়ের ঘনত্ব ও চামড়ার ঔজ্জ্বল্য কমে যাওয়া, কোমড়ে চর্বি জমা, স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া, ঘুম না হওয়া প্রভৃতি এ হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফলে ঘটে।

৩. **অসুখিভাব :** টেস্টোস্টেরণ হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় নিজের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মানবোধ কমে যায়। দুশ্চিন্তা, স্নায়ুদৌর্বল্য বেড়ে যাওয়া, বিষন্নতায় ভোগা, কোনো ধরনের উদ্যোগ বা প্রতিযোগিতাহীনতার প্রকাশ, উত্তেজিত হয়ে উঠা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

৪. **যৌন উত্তেজনা কমে যাওয়া :** টেস্টোস্টেরণের ভারসাম্যহীনতায় যৌন উত্তেজনা কমতে কমতে একেবারে কমে যায়। এমনকি যৌনাঙ্গ উত্থানেও অক্ষম হয়ে পড়ে। পুরুষে টেস্টোস্টেরণের স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ৩৫০-১২৩০ ন্যানোগ্রাম [এক ন্যানোগ্রাম = এক গ্রামের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ]। এভাবে টেস্টোস্টেরণ হরমোনের অভাবে যৌন উত্তেজনা হ্রাস, যৌনাকাঙ্খার অনুপস্থিতি ও পৌরষত্বের প্রকাশহীনতাকে **অ্যান্ড্রোপজ** (andropause) বলে। অ্যান্ড্রোপজকে নারীর **মেনোপজ** (menopause) এর সঙ্গে তুলনা করা হয়।

ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় সমস্যা (Problems during Foetal Development)

ভ্রূণের বৃদ্ধি ও সন্তান ভূমিষ্ঠের ক্ষেত্রে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ভ্রূণের বৃদ্ধি ও সঠিক জন্মদানের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯৭% সফল বলে দাবী করেছে CDC (2011)। সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে একটি সুস্থ সবল শিশুর জন্মদানে কতখানি সর্তক থাকতে হয় সে বিষয়ে সাধারণ ধারণা অর্জনের জন্য এখানে ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় কি কি সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং সাম্প্রতিককালে এসব সমস্যার মোকাবিলার উপায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ভ্রূণের বৃদ্ধিকালীন সমস্যা অন্তহীন। সমস্ত সমস্যাকে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) জিনগত ও ক্রোমোজোমগত সমস্যা এবং (খ) টেরাটোজেনজনিত সমস্যা।

ক. জিনগত ও ক্রোমোজোমগত সমস্যা (Genetic and Chromosomal Problems)

প্রকট ও প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে জন্মের শুরুতেই সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। অটোসোমের মধ্যে অবস্থিত জিনগুলো **অটোসোমাল ব্যাধি** (autosomal disorder)-র সৃষ্টি করে। X-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর কর্মকান্ডে দেখা দেয় সেক্স-লিংকড রোগব্যাধি। নিচে কয়েকটি ব্যধির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **অটোসোমাল ব্যাধি :** অধিকাংশ প্রচ্ছন্ন অটোসোমাল রোগের বিকাশ ভ্রূণে হলেও প্রকাশ ঘটে জন্মের ঠিক পর মুহূর্তে বা শিশু বয়সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশ হাজার শিশুর মধ্যে একজনে এমন একটি অসুখ দেখা যায় যা একটি প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে হয়ে থাকে। এ জিনের প্রভাবে শিশু **ফিনাইল অ্যালানিন** নামক অ্যামিনো এসিড হজম করতে পারে না। এ কারণে মস্তিষ্কে বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়ে শিশুকে মানসিক প্রতিবন্ধিতে পরিণত করে। এ অসুখের নাম **ফিনাইলকিটোনিউরিয়া** (Phenylketonuria)। প্রকট জিনের ব্যাধি হিসেবে **হ্যান্টিংটন-স ব্যাধি** (Huntington disease) বিখ্যাত। এ রোগ আবার শিশু পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ পায় না। এতে মস্তিষ্কের অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও স্নায়ুবিক বৈকল্য ত্বরান্বিত হয়। রোগ শনাক্তের জন্য আগে শিশুকে পূর্ণবয়স্ক হতে হতো, এখন রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে আরো আগেই শনাক্ত করা যায়।

২. **সেক্স-লিংকড ব্যাধি :** লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা ও হিমোফিলিয়া এ দুটি অতিপরিচিত সেক্স-লিংকড ব্যাধি। প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে এ অসুখ হয়। আরেকটি অসুখ আছে তার নাম **ফ্র্যাজাইল-X সিন্ড্রোম** (Fragile-X Syndrome)। প্রতি চার হাজার পুরুষের একজন আর প্রতি আট হাজার নারীর একজন এ অসুখে ভোগে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি X ক্রোমোজোমে ভঙ্গুর বা ক্ষতিগ্রস্ত একটি জায়গা আছে। শিশুর বয়স যতো বাড়ে অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্টতার মাত্রা ততো কমে যায়। কারণ এটি মানসিক প্রতিবন্ধীগত এবং **অটিজম** (autism)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কিত রোগ।

৩. **ট্রাইসোমি :** এটি ক্রোমোজোমঘটিত অন্যতম রোগ। ক্রোমোজোমের বিশৃঙ্খল আচরণে অর্ধশতাধিক অসুখে মানুষ ভোগে এবং এসব রোগের অধিকাংশের প্রতিক্রিয়ার ফলে গর্ভপাত ঘটে থাকে। **ট্রাইসোমি** (trisomy) এমন এক অবস্থা যখন ভুক্তভোগী নির্দিষ্ট অটোসোমের ৩ কপি বহন করে। যেমন সবচেয়ে পরিচিত **ডাউন সিন্ড্রোম** (একে ট্রাইসোমি 21-ও বলে)। এ ক্ষেত্রে শিশুদেহে ক্রোমোজোম 21-এর তিনটি কপি থাকে। এ ধরনের জটিলতা নিয়ে ৮০০-১০০০ শিশুর মধ্যে ১ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ আকৃতির চোখ, মুখ ও গাল, সে সঙ্গে মস্তিষ্কের ছোট আকৃতি, হৃদরোগ প্রভৃতি জটিলতা নিয়ে চরম মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে শিশু জন্ম নেয়, বেড়ে উঠে।

৫. টেরাটোজেনজনিত সমস্যা (Teratogens)

সফল গর্ভধারণই সুস্থ শিশুর জন্মদানের একমাত্র উপায় নয়। ভ্রূণের বৃদ্ধি কোন পরিবেশে হচ্ছে সে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা উচিত। মনে রাখতে হবে, ভ্রূণ এমন কোনো অবস্থায় থাকে না যা পরিবেশের আওতার বাইরে। এ কারণে, দূষিত বহিঃপরিবেশ, মায়ের অসুস্থতা ও ওষুধ গ্রহণ কিংবা মাদক সেবন সবকিছুতে ভ্রূণের বৃদ্ধি প্রভাবিত হয়। ভ্রূণ বৃদ্ধির প্রায় শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে যখন এটি বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রে সজ্জিত ফিটাসে পরিণত হবে সে সময়কালটি সবচেয়ে বেশি বিপদসংকুল। তখন বিভিন্ন পরিবেশিক কারণে অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গহানি ঘটে। এ সব বিকৃতি বা হানি-র জন্য যে কারণগুলো দায়ী সেগুলোই হচ্ছে **টেরাটোজেন**। নিচে কতকগুলো টেরাটোজেন ও মানবভ্রূণে তার কুফল আলোচনা করা হলো।

১. **রুবেলা / জার্মান হাম** (Rubella / German Measles) : ভ্রূণাবস্থায় রুবেলা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে ভ্রূণের গর্ভপাত ঘটে কিংবা ভূমিষ্ঠ হলেও অন্ধ, বধির, মানসিক প্রতিবন্ধী, হৃৎপিন্ড ও স্নায়ুতন্ত্রে ত্রুটি নিয়ে জন্মায়।

২. **HIV ও হেপাটাইটিস B** : এ ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত মাতৃদেহে বর্ধনশীল ভ্রূণ জন্মগত অঙ্গবিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং জীবনহরণকারী সংক্রমণ হিসেবে পরিচিত।

৩. **সাইটোমেগালোভাইরাস** (Cytomegalovirus, CMV) : এটি হারপিস গ্রুপভুক্ত ভাইরাস। পূর্ণবয়স্ক মানুষে এ ভাইরাস কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ প্রকাশ করে না বলে এর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কিন্তু সন্তান জন্মগত পঙ্গু হয়ে জন্মায়। সিফিলিসের সংক্রমণে শিশু চোখ, কান ও মস্তিষ্কের খুঁত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।

৪. **দীর্ঘকালীন অসুস্থতা** (Chronic illness) : হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও লুপাস (lupus) নামে চর্মক্ষত রোগ, ভ্রূণের পরিস্ফুটনে প্রভাব ফেলে। ডায়াবেটিক মা'দের বিপাকীয় তারতম্যের কারণে যেভাবে রক্তে চিনির মাত্রার তারতম্য ঘটে এবং তার মাত্রা সঠিক রাখতে সুচিন্তিত ব্যবস্থা না নিলে ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্র মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. **ধূমপান** (Smoking) : ধূমপায়ী মায়ের ভ্রূণ বৃদ্ধিকালীন সময়ে মারাত্মক পুষ্টি সংকটে ভোগে ফলে কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তামাক (সিগারেট) জাতীয় দ্রব্যাদির প্রধান উপাদান নিকোটিন। নিকোটিন রক্তবাহিকার নালি সংকুচিত করে দেয় ফলে অমরায় রক্ত প্রবাহ ও পুষ্টি পদার্থের পরিমাণ কমে যায়, ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৬. **মদপান** : বর্ধনশীল ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ করে অবাধে মদপান করলে ভূমিষ্ঠ শিশু যে অসুখে ভোগ তার নাম **ফিটাল অ্যালকোহল সিন্ড্রোম** (Foetal Alcohol Syndrome, সংক্ষেপে FAS)। যে মায়েরা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী বা অ্যালকোহলিক তাদের গর্ভস্থ ভ্রূণ যে সব ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার প্রকাশ ঘটে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর।

৭. **খাদ্যগ্রহণ** : গর্ভবতী মায়ের খাদ্য গ্রহণের বিষয়টি সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই অন্ততঃ এ বিষয়ে সজাগ যে ভ্রূণের স্বাভাবিক ও সুস্থ বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর ও বাড়তি খাবার প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় নিউরাল নালির পরিস্ফুটনে ফলিক এসিডযুক্ত খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। কোনো নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিংবা তা জানার আগেই ভ্রূণের নিউরাল নালির পরিস্ফুটন শুরু হয়ে যায়। অতএব, আহারের বাছ-বিচার অত্যন্ত জরুরী।

৮. **মানসিক অবস্থা** : ভ্রূণের বৃদ্ধিকালিন সময়কালটি বাংলাদেশের ধনী-গরীব সব পরিবারই সচেষ্ট থাকে যেন মা ও শিশু সুস্থ থাকে। পরিবারে বয়স্ক সদস্যের নির্দেশও থাকে যেন মায়ের মন সবসময় আনন্দে থাকে। আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও প্রমাণিত হয়েছে যে প্রফুল্ল থাকা মায়ের ভ্রূণ যেভাবে বর্ধিত হয় বিষন্ন মায়ের ভ্রূণ তেমনটি হয় না।

যৌনবাহিত রোগ (Sexually Transmitted Diseases)

যে সব রোগ যৌন মিলনের সময় সংক্রমণের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সে সব রোগকে **যৌনবাহিত রোগ** (Sexually Transmitted Diseases, STDs) বলে। চিকিৎসাবিদ্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংক্রমণের কোন লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে রোগ (disease) বলে। যেহেতু অনেক সময় যৌনবাহিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না সেই এ অবস্থাকে যৌনবাহিত রোগ না বলে **যৌনবাহিত সংক্রমণ** (sexually transmitted infections) বলে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাক না পাক সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো যৌনবাহিত রোগ নামেই বহুল পরিচিত। অনেক ধরনের যৌনবাহিত রোগ ও সংক্রমণ রয়েছে। কেবল নিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমেই এসব রোগ ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ বইয়ে সিলেবাসভুক্ত ৩টি যৌনবাহিত রোগ (সিফিলিস, গনোরিয়া ও এইডস) এর লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সিফিলিস শনাক্ত করা হয় নিম্নোক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে:—
TPHA Test, FTA Abs test, VDRL Test

ক. সিফিলিস (Syphilis)

Treponema pallidum নামক ব্যাকটেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে **সিফিলিস** বলে। এ রোগে দেহে দীর্ঘকালীন জটিলতা দেখা দেয় এবং সঠিক চিকিৎসা না করালে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

সংক্রমণ প্রক্রিয়া (Mode of Transmission)

সিফিলিস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে সৃষ্ট সিফিলিটিক ক্ষত (siphilitic sore)-এর সরাসরি সংস্পর্শে এলে জনান্তরে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সিফিলিটিক ক্ষত প্রধানত বহির্যৌনাঙ্গ, যোনি, পায়ু বা মলাশয়ে অবস্থান করে, কিছু দেখা যায় ঠোঁট ও মুখে। যৌনমিলনের ধরনের উপর (যোনি, পায়ু, মুখ) সংক্রমণের উৎস নির্ভর করে। সিফিলিসে আক্রান্ত গর্ভবতী মহিলা সন্তান ভূমিষ্ঠের আগেই তার শরীরে সিফিলিস রোগের বিস্তার ঘটিয়ে দেয়। সিফিলিসের জীবাণুতে সংক্রমিত হলে সাধারণত ২১ দিনের মাথায় রোগের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে, তবে ব্যক্তি বিশেষে সময়কাল ১০-৯০ দিন হতে পারে।

লক্ষণ (Symptoms)

সিফিলিসের প্রথম লক্ষণ যেমন বেশ দেরিতে (অর্থাৎ ২১ দিন পর) প্রকাশ পায় তেমনি শেষ পর্যায়ে যেতেও অনেক সপ্তাহ, মাস বা বছর পেরিয়ে যায়। লক্ষণ প্রকাশের সময়কালকে ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

১. প্রাথমিক পর্যায় (Primary stage) : ২১ দিন পর ১টি মাত্র সিফিলিটিক ক্ষত প্রকাশিত হয়। এটি দৃঢ়, গোল ও ব্যথাহীন ক্ষত। এটি দেখে বোঝা যায় জীবাণু কোন পথে সংক্রমিত হয়েছে। তিন থেকে ছয় সপ্তাহ পর ক্ষতপূরণ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে ধাবিত হয়।

২. মাধ্যমিক পর্যায় (Secondary Stage) : গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি (rash) দেখা দেয়া এবং সিফিলিটিক ক্ষত অমসৃণ, লাল বা লালচে বাদামী দাগ হিসেবে হাত-পায়ের তালুতে আবির্ভূত হওয়া এ পর্যায়ের লক্ষণ। ক্ষত ছাড়াও জ্বর, স্ফীত লসিকা গ্রন্থি, গলাভাঙ্গা, বিভিন্ন জায়গায় চুল উঠে যাওয়া, মাথাব্যথা, ওজন কমে যাওয়া, পেশিব্যথা, ক্লান্তি প্রভৃতিও এ পর্যায়ে দেখা দেয়।

৩. সুপ্ত পর্যায় (Latent stage) : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের লক্ষণগুলো অদৃশ্য হলে শুরু হয় সুপ্ত পর্যায়। এ সময় আক্রান্তের দেহে কোনো ক্ষত, ফুসকুড়ি বা অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায় না। বছরের পর বছর এ পর্যায় অব্যাহত থাকতে পারে।

৪. বিলম্বিত পর্যায় (Late stage) : জীবাণুতে প্রথম সংক্রমিত হওয়ার প্রায় ১০-২০ বছর পর সিফিলিস পূর্ণাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়। রোগের বিলম্বিত দশায় রোগীর মস্তিষ্ক, স্নায়ু, চোখ, হৃৎপিন্ড, রক্তকণিকা, যকৃত, গ্রন্থি ও সন্ধির ক্ষতি সাধন করে। ফলে পেশি সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটে, দেখা দেয় পঙ্গুত্ব, অন্ধত্ব, হতবুদ্ধি ও অস্থিরচিত্ত। এ অবস্থায় মানুষের মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার (Remedy)

প্রতিরোধ : সিফিলিসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে **স্থায়ী সঙ্গীর সঙ্গে জীবনযাপন** করা। ভিন্ন সঙ্গীর কথা চিন্তাই করা উচিত নয়। কিংবা কোথাও সিফিলিস রোগী আছে এমন ঘরে যাওয়া-আসা করাও নিরাপদ নয়। তা ছাড়া, অ্যালকোহল ও মাদক জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ এসব পান বা সেবন যৌন আচরণকে উসকে দেয়, তখন সঙ্গী নির্বাচন সঠিক নাও হতে পারে।

চিকিৎসা : সিফিলিসের লক্ষণ জানা থাকলে প্রাথমিক পর্যায়ে সহজেই চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়। কারও দেহে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায় বা প্রাক-সুপ্ত পর্যায়ের সিফিলিস জীবাণু থাকলে তাকে একটি মাত্র Benzathine Pe n G ইনজেকশন দিলেই রোগ দূর হতে পারে। সুপ্ত পর্যায়ের শেষ অবস্থায় কেউ থাকলে তাকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ইনজেকশন দিতে হয়। চিকিৎসার ফলে সিফিলিস সারবে কিন্তু দেহের ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যুর ক্ষত পূরণ হবে না। সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত যৌন মিলন থেকে নিজেকে বা অন্যকে বিরত রাখতে হবে।

খ. গনোরিয়া (Gonorrhea)

MAT

Neisseria gonorrhoeae প্রজাতিভুক্ত ব্যাকটেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে **গনোরিয়া** বলে। *N. gonorrhoeae* নারীর জনন নালি (সারভিক্স, জরায়ু, ফেলোপিয়ান নালিসহ) এবং নারী ও পুরুষের ইউরেথ্রার মিউকাস ঝিল্লিতে সংক্রমণ ঘটায়। মুখ, গলা, চোখ ও পায়ুর মিউকাস ঝিল্লিও এ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আক্রান্ত হয়। গর্ভকালীন জটিলতা ছাড়াও নারী-পুরুষ উভয়ে বন্ধ্যা-বন্ধ্য হয়ে যেতে পারে।

মায়ের গনোরিয়া হলে শিশু অফথ্যালমিয়া নিওনেটোরাম নামক রোগের প্রভাব

সংক্রমণ প্রক্রিয়া (Mode of Transmission)

যৌন মিলনের সময় আক্রান্ত দেহের বহির্যৌনাঙ্গ, মুখ ও পায়ু থেকে সংক্রমণ ঘটে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ও আক্রান্ত মাতৃদেহ থেকে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। যে ব্যক্তি এক সময় গনোরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসায় সেরে উঠেছে এমন ব্যক্তি গনোরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে পুনর্মিলন ঘটালে সেও পুনঃসংক্রমিত হতে পারে। গনোরিয়ায় আক্রান্ত অনেক ব্যক্তির দেহে তেমন স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায় না বলে এটি ব্যাপক বিস্তৃত যৌনবাহিত অসুখ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। গনোরিয়া রোগ

লক্ষণ (Symptoms) 50-75% মহিলা উপসর্গহীন অবস্থায় থাকে।

নারীদের গনোরিয়ার লক্ষণগুলো হচ্ছে : উদরীয় ব্যথা; দুই রজঃচক্রের মধ্যবর্তী সময়ে প্রচুর যোনিস্রাব ও রক্তপাত; অনিয়মিত রজঃচক্র; জ্বর ও গায়ে ফুসকুড়ি; কষ্টদায়ক যৌনমিলন; কষ্টদায়ক মূত্রত্যাগ; যোনিদেশ ফুলে যাওয়া; স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মূত্রত্যাগের প্রবণতা; হলদে বা হলদে-সবুজ যোনিস্রাব; অস্থিসন্ধিতে ব্যথা প্রভৃতি।

পুরুষের গনোরিয়ার লক্ষণগুলো হচ্ছে : প্রস্রাবে জ্বালা-পোড়া-ব্যথা অনুভব; প্রস্রাবের পর চাপ দিলে আঠার মতো পুঁজ বের হয়; স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা; শুক্রাশয় ও অণ্ডথলিতে ব্যথা প্রভৃতি। পুরুষে এসব লক্ষণগুলো শুধু সকালে, তাও হালকা অনুভূত হয় বলে অনেকে বুঝতেই পারে না যে, সে গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

গনোরিয়ায় আক্রান্ত **পুরুষ ও নারী উভয় দেহে** মলাশয় থেকে স্রাব, পায়ুপথে চুলকানি, ক্ষত, রক্তপাত, মলত্যাগে প্রচণ্ড ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। তা ছাড়া, গলবিল সংক্রমিত হলে গলাভাঙ্গা-র উদ্ভব ঘটে।

প্রতিকার (Remedy) 10-15% পুরুষ উপসর্গহীন অবস্থায় থাকে।

সামান্য সতর্কতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখলে গনোরিয়ার মতো মারাত্মক যৌনবাহিত রোগ থেকে ... ও ভবিষ্যৎ বংশধরকে নিরাপত্তা দেওয়া খুব সহজ। এ জন্যে যা করা দরকার তা হচ্ছে : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে ... বয়সী ও গর্ভবতী নারীদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে হবে; যৌনসঙ্গী নির্বাচনে অবশ্যই সর্তক ও নিশ্চিত ... হবে; চিকিৎসকের প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী ওষুধ খেতে বা লাগাতে হবে; নিরোগ না হওয়া পর্যন্ত মিলনে প্রবৃত্ত না হওয়া; প্রতিবার মিলনকালে কনডম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

গ. এইডস (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) MAT

AIDS হলো Acquired (অর্জিত) Immune (ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) Deficiency (ডেফিসিয়েন্সি বা হ্রাস) Syndrome (সিনড্রোম বা অবস্থা) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ **বিশেষ কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়াকে এইডস (AIDS) বলে**। Human Immunodeficiency Virus, সংক্ষেপে HIV নামক ভাইরাস দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়। HIV ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের শ্বেত রক্তকণিকার ম্যাক্রোফেজ ও T4 লিম্ফোসাইট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যায়। বর্তমান বিশ্বে AIDS একটি মারাত্মক রোগ। ২০০০ সালে বিশ্বে HIV আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। এদের মধ্যে মারা যায় প্রায় ৩০ লক্ষ। আফ্রিকান দেশসমূহে HIV-র আক্রমণ বেশি লক্ষ করা যায়।

চিত্র ৯.১৮ লালফিতা; HIV পজেটিভ ব্যক্তি ও এইডস-এ আক্রান্তদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশের প্রতীক।

ধারণা করা হয় বানরের দেহে এই ভাইরাসটি ছিল যা সর্বপ্রথম আফ্রিকায় বানর থেকে মানুষে স্থানান্তরিত হয় এবং পরে তা আমেরিকা, ইউরোপ তথা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালে ফ্রান্সের পাস্তুর ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী Dr. Luc Montagnier এবং আমেরিকার ন্যাশনাল কেমিক্যাল ইনস্টিটিউট এর Dr. Robert Gallo ১৯৮৪ সালে পৃথকভাবে AIDS এর জীবাণু আবিষ্কার করেন।

AIDS-এর বিস্তার (Spread of AIDS)

বিভিন্ন উপায়ে এইডসের ভাইরাস একজন সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। যেমন- নারী-পুরুষের অস্বাভাবিক ও অসামাজিক যৌন আচরণ, সংক্রমিত সিরিঞ্জ ব্যবহার, সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ, সংক্রমিত মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশু, সেলুনে একই ব্লেড বা ক্ষুর বিভিন্ন জনে ব্যবহার করা, দন্ত চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা গ্রহণকারী ইত্যাদি।

রোগের লক্ষণ

এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর শ্বেতরক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ফলে রোগীর দেহ ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারাতে থাকে এবং নিচে বর্ণিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে–

প্রাথমিক অবস্থায় দেহে জ্বর আসে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে জ্বর দীর্ঘায়িত হয়; দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি ফুলে যায় এবং শরীর শুকিয়ে যায় ও ওজন কমতে থাকে; পেটে ব্যথা হয় এবং খাবারে অনীহা সৃষ্টি হয়; ফুসফুসে জীবাণুর আক্রমণ ঘটে এবং বুকে ব্যাথাসহ শুষ্ক কফ জমে; অস্থিসন্ধিসমূহে প্রচন্ড ব্যথা সৃষ্টি হয় এবং দেহে জ্বালাপোড়া হয়; শ্বাসকষ্ট, জিহ্বায় সাদা স্তর জমা, ত্বকের মিউকাস ঝিল্লি বা যে কোনো ছিদ্র থেকে রক্তপাত, ঘন ঘন ফুসকুড়ি, সার্বক্ষণিক মাথা ব্যাথা এবং ক্রমশঃ স্মৃতিশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়; সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রোগী যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অন্ধত্ব প্রভৃতি একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে।

এইডস-এর লক্ষণ নারী-পুরুষে প্রায় এক রকম হলেও নারীদেহে কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়, যেমন–যোনিতে দীর্ঘস্থায়ী বা অনিরাময়যোগ্য ঈস্টের সংক্রমণ। এ সংক্রমণ সুস্থ নারীদেহে দ্রুত সেরে যায়। জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সংক্রমণজনিত প্রচন্ড জ্বালাপোড়া ও ব্যথা সৃষ্টি হয়। জরায়ু-গাত্রে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV)-এর আক্রমণে টিউমার হওয়া এবং পরবর্তীতে সার্ভিক্স ক্যান্সারে রূপ নেয়া আরেকটি লক্ষণ।

রোগ নির্ণয় : রক্ত পরীক্ষা করে দেহে HIV-র এর উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। রক্তে পরীক্ষাগুলো হলো-HIV অ্যান্টিবডি টেস্ট, RNA টেস্ট, Western Blotting test) p24 Protein Test,

প্রতিকার এইডস চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে ঔষধ প্রয়োগ :-

প্রতিরোধ : এইডস প্রতিরোধে নিচে বর্ণিত পদক্ষেপ নেয়া উচিত NRTIs, NNRTIs, PIs, HAART

নিরাপদ যৌন সঙ্গম করা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি মেনে চলা। অনিরাপদ যৌন মিলন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা; যৌন মিলনে কনডমের ব্যবহার এবং এইডস থেকে রক্ষায় এর ভূমিকা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা; এইডস-এর ভয়াবহতা সম্পর্কে রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, বিলবোর্ড, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা; ইনজেকশন গ্রহণের সময় ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনরায় ব্যবহার না করা এবং শিরার মাধ্যমে কোন ড্রাগ গ্রহণ না করা; সেলুনে একটি ব্লেড একবারই ব্যবহার করা; সংক্রমিত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে সম্পূর্ণভাবে আলাদা রেখে চিকিৎসা প্রদান করা; পতিতাদের নিরাপদ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন করা; প্রতিবার মিলনকালে কনডম ব্যবহার করা প্রভৃতি।

চিকিৎসা : AIDS রোগের চিকিৎসা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। গবেষকগণ এ সংক্রান্ত অনেক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। তবে দুটি গ্রুপের ওষুধের ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রথম গ্রুপের ওষুধের নাম **নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ ইনহিবিটরস** (Nucleoside reverse transcriptase inhibitors)। এটি HIV সংক্রমণকে বিলম্বিত করে। দ্বিতীয় গ্রুপের ওষুধের নাম **প্রোটিয়েজ ইনহিবিটরস** (Protease inhibitors)। এটি HIV-এর প্রতিলিপনে বাঁধা সৃষ্টি করে। এই দুটি গ্রুপের ওষুধ একত্রে সেবন করতে হয়। AIDS-এর এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) বলা হয়। HAART যদিও এইডস রোগকে উপশম করে না তবে রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ফ্রোটাম : যে বিশেষ থলির ভিতর শুক্রাশয়দুটি অবস্থান করে তার নাম স্ক্রোটাম। এটি দুই উরুর মাঝখানে ঝুলে থাকে।

ইমপ্ল্যান্টেশন : নিষেকের পর ক্লিভেজের মাধ্যমে বিভাজিত জাইগোট ব্লাস্টোসিস্ট এ পরিণত হয়। নিষেকের ৬ষ্ঠ–৯ম দিনের মাথায় ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে যে প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হয় তাকে ইমপ্ল্যান্টেশন বলে।

বয়ঃসন্ধিকাল : বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে পুরুষে ১৩ – ১৫ বছরের মধ্যে এবং নারীতে ১২ – ১৩ বছরের মধ্যে দৈহিক ও চারিত্রিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, এগুলোকে সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য বলে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিরূপে সেকেন্ডারি বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের সক্রিয় পরিস্ফুটনকালই বয়ঃসন্ধিকাল।